অট্টহাসি
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

অট্টহাসি-৭৩

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জুলাই ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

জ্যোতির্ময় চমকে উঠলো।

দিপালী বললো—ভয় নেই রাজকুমার, সেই হতভাগ্যটিকে নির্যাতন করা হচ্ছে।

উঃ, কি পিশাচ তোমরা!

হাঁ রাজকুমার, আমরা পিচাশই বটে। দিনের পর দিন আমরা নিরীহ মানুষের বুকের রক্ত নিংড়ে নেই। এমনি করে কত জীবন যে আমাদের এখানে নিঃশেষ হয়ে গেছে......একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে দিপালী।

জ্যোতির্ময় কোনো উত্তর না দিয়ে এগুতে থাকে।

সুড়ঙ্গপথে এগুচ্ছিলো ওরা।

সুড়ঙ্গপথে তেমন কোনো আলো ছিলো না। আধো অন্ধকারে অতি সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছিলো জ্যোতির্ময় আর দিপালী।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি পরিলক্ষিত হলো।

থমকে দাঁড়িয়ে ছায়ামূর্তি পরিলক্ষিত হলো।

জ্যোতির্ময় কিছু বলতে যাচ্ছিলো, দিপালী ওর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে অপর হাতের একটি অংগুলি ঠোঁটে চাপা দিয়ে বললো—চুপ!

দিপালীর থেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ময় নিজেও থেমে পড়েছিলো!

ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই বললো দিপালী—আর একটু হলেই সর্বনাশ হতো।

অবাক কণ্ঠে বললো জ্যোতির্ময়—কেন?

দিপালী চাপাকণ্ঠে বললো—বাবা ঐদিকে গেলো। একটু থেমে বললো সে—চলুন রাজকুমার, ফিরে যাই।

জ্যোতির্ময় বললো—না, এতোদূর এসে ফিরে যেতে আমি চাই না দিপালী।

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নেই, চলো।

বাবা আছে সেখানে......

থাকলোই বা.......

এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে একটা তীব্র আর্তনাদ। অতি যন্ত্রণাদায়ক মর্মস্পর্শী করুণ কণ্ঠস্বর। সমস্ত সুড়ঙ্গপথ যেন সে আর্তনাদের শব্দে শিউরে উঠছে।

দিপালী বললো—ও দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারবো না রাজকুমার। আপনি যান, আমি এখানে অপেক্ষা করছি। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন দেখে না ফেলে।

জ্যোতির্ময় বললো—আমি নিজে সতর্ক এবং সাবধান আছি দিপালী, তুমি আমার জন্য কিচ্ছু ভেবো না।

এগুলো জ্যোতির্ময়।

দিপালী দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

আর সামান্য পথ এগুলেই সুড়ঙ্গপথ শেষ হবে এবং একটি আধো অন্ধকার কক্ষ দেখা যাবে। সেখানেই রাখা হয়েছে সেই বন্দী লোকটিকে। হাত-পা লৌহশিকলে আবদ্ধ, সমস্ত শরীরে কষাঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। স্থানে স্থানে কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে।

জ্যোতির্ময় আড়ালে এসে দাঁড়ালো। সম্মুখে দৃষ্টি পড়তেই শিউরে উঠলো সে, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো রাজকুমার।

কখন যে দিপালী তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো বুঝতে পারেনি জ্যোতির্ময়। দিপালী জ্যোতির্ময়ের কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে উঠলো জ্যোতির্ময়, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—তুমি।

হাঁ, এলাম।

কি নির্মম দৃশ্য!

ঠিক ঐ মুহূর্তে দু'জন লোক একটি লৌহকড়াই ধরে নিয়ে এলো। লৌহকড়াইর মধ্যে গনগনে আগুন জ্বলছে। আগুনে গোঁজা রয়েছে দুটো লৌহ সাঁড়াশি।

দিপালী আর জ্যোতির্ময় বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওদের দু'চোখে ফুটে উঠেছে একটা ভীতিকর ভাব।

জ্যোতির্ময় কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

দিপালী ওর মুখে হাতচাপা দিলো।

সেখানে আরও তিনজন এসে দাঁড়িয়েছে। দিপালী আর জ্যোতির্ময় তাকিয়ে দেখলো, তাদের মধ্যে রয়েছে কান্তা বারের দু'জন লোক আর দিপালীর বাবা হিম্মৎ খাঁ।

হিম্মৎ খাঁ আদেশ দিলো—ওকে চিরদিনের মত অন্ধ করে দাও।

অমনি দু'জন লোক যারা লৌহকড়াই বহন করে আনলো তারা অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দুটো তুলে নিলো হাতে, তারপর ভয়ঙ্কর একটা শব্দ করে এগুতে লাগলো বন্দীর দিকে।

ঐ সময় হঠাৎ জ্যোতির্ময় দিপালীকে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো এবং মুহূর্তে প্যান্টের পকেট থেকে একটি রিভলভার বের করে চেপে ধরলো হিম্মৎ খাঁর বুকে।

হিম্মৎ খাঁ কিছু বঝবার পূর্বেই জ্যোতির্ময়ের রিভলবার তার বুক থেকে সরে গর্জে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে লুটিয়ে পড়লো একজন লৌহশলাকাধারী শয়তান। পরমুহূর্তে দ্বিতীয় ব্যক্তিও লুটিয়ে পড়লো।

হিম্মৎ খাঁ এমন একটা অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। সে উপস্থিত কোনো একটা অস্ত্রের সন্ধানে তাকালো এদিক ওদিক।

হিম্মৎ খাঁর সঙ্গীদ্বয়ও পালাতে যাচ্ছিলো কিন্তু পালাবার সময় পেলো না তারা। জ্যোতির্ময়ের রিভলভারের গুলী তাদের হৃৎপিন্ড বিদীর্ণ করলো।

দিপালীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। রাজকুমার জ্যোতির্ময়কে সে একজন নিরীহ লোক মনে করেছিলো, কিন্তু এ মুহূর্তে তার রুদ্রমূর্তি দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

হিম্মৎ খাঁও কম অবাক হয়নি, সে জ্যোতির্ময়কে কান্তা রারের একজন বড়রকমের খদ্দের মনে করে এসেছে এতোদিন। জ্যোতির্ময় আসার পর থেকে তার কান্তা বারের উপার্জন বেড়ে গেছে দ্বিগুণভাবে, কাজেই ওকে হিম্মৎ খাঁ সব সময় সমীহ করে এসেছে একান্তভাবে। আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে সেই খদ্দেরকে অদ্ভুত এক মূর্তিতে দেখে হতবাক হবার কথাই বটে।

কিন্তু বেশিক্ষণ সময় লাগলো না হিম্মৎ খাঁর সামলে উঠতে। সে আক্রমণ করলো ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত জ্যোতির্ময়কে। কিন্তু জ্যোতির্ময় ক্ষিপ্রগতিতে একপাশে সরে গিয়ে হিম্মৎ খাঁর বুক লক্ষ্য করে রিভলবার

উঁচিয়ে ধরলো—সাবধান, একটুও নড়বে না, তাহলে ওদের মত তোমাকেও এক্ষুণি যমালয়ে পাঠাব।

বন্দীর দু'চোখে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। এতোক্ষণ তার চোখ দুটো চিরতরে অন্ধ হয়ে যেতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো সে—দস্যু বনহুর!

হিম্মৎ খাঁ মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলো, তার কণ্ঠ দিয়েও বেরিয়ে এলো—দস্যু বনহুর!

জ্যোতির্ময় গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললো—হাঁ, আমি তোমাদের যমদূত দস্যু বনহুর।

দিপালীর দু'চোখে শুধু বিস্ময় নয়, দু'চোখে তার বিরাট একটা জিজ্ঞাসা, একটা প্রশ্ন। সেও মনে মনে বলে উঠলো—রাজকুমার জ্যোতির্ময় তাহলে দস্যু বনহুর!

বনহুরের রিভলভারের আগা তখন হিম্মৎ খাঁর বুকে ঠেকে আছে।

হিম্মৎ খাঁ একচুল নড়তে পারছে না।

তার সহচরদের রক্ত গড়িয়ে আসছে পায়ের নিচে। হিম্মৎ খাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। বনহুর ওকে লক্ষ্য করে বললো—মনে রেখো শয়তান, ওদের মতো তোমাকে এতো সহজে পারপারে পাঠাবো না। চলো এগিয়ে চলো, নিজের হাতে খুলে দাও মিঃ হেলালীর দেহের লৌহশিকল।

দিপালী অবাক হয়ে দেখছে—একি সে স্বপ্ন দেখছে না সত্য, ভেবে পাচ্ছে না। জ্যোতির্ময় যে দস্যু বনহুর, এ কথা সে ভাবতে পারছে না কিছুতেই।

হিম্মৎ খাঁর কণ্ঠনালী শুকিয়ে এসেছে। সে নিরুপায়ভাবে এগিয়ে গেলো, তারপর নিজের হাতে মিঃ হেলালীর দেহের বন্ধন মুক্ত করে দিলো।

বনহুর এবার মিঃ হেলালীর দেহের মুক্ত লৌহশিকল পরিয়ে দিলো হিম্মৎ খাঁর শরীরে, তারপর বললো—এই গোপন কক্ষে তুমি বন্দী থাকো—এখানে কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না। যতোদিন মিঃ হেলালীকে বন্দী করে রেখেছিলে ততোদিন তোমাকে পৃথিবীর বুকে নরক জ্বালা পোহাতে হবে। প্রতিদিন তোমার দেহে একশত করে বেত্রাঘাত করা হবে আর

তোমাকে জীবিত রাখার জন্য এই মৃতদেহগুলো থেকে গলিত মাংস ভক্ষণ করানো হবে......

দিপালী ছুটে আসে, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠে—রাজকুমার, আমার বাবাকে আপনি ক্ষমা করুন।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দস্যু বনহুর—ক্ষমা! ক্ষমা করবো তোমার বাবাকে? শয়তানকে ক্ষমা করা চলে তবু তোমার বাবাকে ক্ষমা করা চলে না।

এবার বনহুর মিঃ হেলালীর দেহের দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বলে—আপনি ভুল করেছিলেন এবং সে কারণেই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করলেন।

মিঃ হেলালী বনহুরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন—আপনি দস্যু হয়ে এতো মহৎ, কি বলে যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবো......

থাক সে কথা। এখন আপনি কান্তা বারে গিয়ে পুলিশ অফিসে ফোন করুন। আপনাকে আমি সাহায্য করছি চলুন। দিপালী, তুমিও মিঃ হেলালীকে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

দিপালী কাতর চোখে বারবার হিম্মৎ খাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো এবং তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুধারা।

বনহুর বললো—দিপালী, তুমি ওর আসল পরিচয় জানো না। হিম্মৎ খাঁ তোমার বাবা নয়, সে তোমাকে ছোটবেলায় চুরি করে এনেছিলো। সে একজন চির অসৎ ব্যক্তি। পরে সব তোমাকে খুলে বলবো, কারণ এখন মিঃ হেলালীর দ্রুত চিকিৎসার দরকার। হাঁ আর একটি কথা, রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের ছদ্মবেশে আমি অনেক সময় তোমার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করেছি, সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো দিপালী, তাছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। তোমার অজান্তে আমি তোমার কাছ থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছি...

আপনি তাহলে মস্তকহীন নরহত্যার...

হাঁ দিপালী, ও আমার নরহত্যা নয়—রক্তের নেশা! রক্তের নেশায় আমি উম্মত্ত হয়ে পড়েছিলাম। দিপালী, তোমাদের কান্তা বারেরই একটি সুন্দর কক্ষে সেই নর শয়তানদের মস্তকগুলো স্তূপাকার করে সাজিয়ে রেখেছি।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে দিপালী—কান্তা বারের অভ্যন্তরে সেই কাটা মস্তকগুলো স্তূপাকার করে সাজি রেখেছেন?

হাঁ, হাঁ দিপালী। পুলিশ এলে তাদের কাছে জানাবে, তারা সন্ধান করে নেবে কোথায় সেই মস্তকের স্তূপ রয়েছে।

মিঃ হেলালী দেয়ালে ঠেশ দিয়ে ধুঁকছিলেন।

বনহুর তাঁকে ধরে বললো—চলুন উপরে চলুন। এসো দিপালী, ওর ঐপাশে ধরুন।

দিপালী এসে মিঃ হেলালীর একটি হাত কাঁধের উপর তুলে নিলো।

বনহুর আর দিপালীর সহায়তায় সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে চললেন মিঃ হেলালী। ক্ষুধা-পিপাসায় তিনি এতো বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, একটি কথাও বলতে পারছিলেন না। টেনে টেনে অতিকষ্টে পা তুলে এগুচ্ছিলেন।

একসময় পৌঁছে যায় ওরা সুড়ঙ্গপথের শেষ মুখে। সেখানে একটি লিফ্‌ট ছিলো।

বনহুর মিঃ হেলালীকে লিফ্‌টে তুলে ধরলো।

দিপালীও এসে দাঁড়ালো লিফ্‌টের উপরে।

একটা বোতামে চাপ দিতেই লিফ্‌টখানা সাঁ সাঁ করে উপরে উঠতে লাগলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

লিফ্‌ট এসে থেমে গেলো। লিফ্‌টের দরজা আপনা আপনি খুলে গেলো।

বনহুর এবং দিপালী মিঃ হেলালী সহ নেমে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে লিফ্‌ট নেমে গেলো নিচে।

দিপালী বললো—কান্তা বারে এখনও বহু শয়তান আত্নগোপন করে আছে।

বনহুর বললো—সবাইকে আমি তাদের উপযুক্ত যায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি, কাজেই কান্তা বার শূন্য। কান্তা বারের অতল গহ্বরে তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে হিম্মত খাঁ। লিফ্‌টের চাবি আমি ভেঙ্গে দিয়েছি। লিফ্‌টখানা আর কোনোদিন উপরে উঠে আসবে না বা কেউ কোনোদিন ঐ অন্ধকার কারাকক্ষের সুড়ঙ্গপথে নিচে নেমে যেতে পারবে না।

মিঃ হেলালীকে সঙ্গে করে কান্তা বারের সুসজ্জিত একটি কক্ষে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর দিপালী।

দিপালী অবাক হয়ে গেলো।

সে জ্ঞান হবার পর কান্তা বার কোনোদিন এমন নীরব দেখেনি। কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। সবাই গেলো কোথায়?

বনহুর মিঃ হেলালীর হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে বললো—পুলিশ অফিসে ফোন করুন।

মিঃ হেলালী বললেন—আমার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে, আমি কোনো কথা বলতে পারছি না।

বেশ, আমিই করছি। বনহুর নিজেই পুলিশ অফিসে ফোন করলো—হ্যালো...কে কথা বলছেন?

ওপাশ থেকে কণ্ঠ ভেসে এলো মিঃ হাসানের...আমি ইসপেক্টর হাসান বলছি...হ্যালো আপনি কে এবং কোথা থেকে বলছেন...

...দস্যু বনহুর...কান্তা বার থেকে বলছি...

মিঃ হাসানের হাত থেকে রিসিভার খসে পড়তে যাচ্ছিলো, তিনি রিসিভার শক্ত করে ধরে বললেন...দস্যু বনহুর...তুমি...তুমি...হাঙ্গেরী ...কারাগার থেকে পালিয়েছো...

...না, হাঙ্গেরী কারাগারে আমি ছিলাম না...যাকে হাঙ্গেরী কারাগারে রাখা হয়েছে, সে ঠিকই সেখানে রয়েছে...আপনারা পুলিশ বাহিনী এবং পুলিশ ভ্যান নিয়ে এক্ষুণি কান্তা বারে চলে আসুন... মিঃ হেলালী মুক্তি পেয়েছেন...তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন...শীঘ্র চিকিৎসার প্রয়োজন...

মিঃ হাসান যেন থ' বনে গেছেন। দস্যু বনহুর স্বয়ং তার কাছে পুলিশ অফিসে ফোন করেছে, এটা যেন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, কারণ দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে ফোন করলো কে সে?

মিঃ হাসান পুলিশ ফোর্স নিয়ে কান্তা বারে যাবেন কিনা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি কয়েক স্থানে ফোন করলেন। প্রথমে করলেন মিঃ জায়েদী, মিঃ জাফরী এবং কয়েকজন পুলিশ অফিসারের কাছে।

সবাই মিঃ হাসানের ফোন পেয়ে বিস্মিত-হতবাক স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। তারা জানেন দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী আছে কিন্তু একি কথা,

দস্যু বনহুর কান্তা বার থেকে এই মুহূর্তে ফোন করেছে, এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ওয়্যারলেসে মিলিটারী ক্যাম্পে জানিয়ে দিলেন মিঃ হাসান, এক্ষুণি যেন কিছুসংখ্যক মিলিটারী নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা চলে আসেন।

সমস্ত পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে গেলো।

শহরময় ছুটোছুটি শুরু হলো পুলিশ আর মিলিটারী ভ্যানে!

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ জাফরী পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন কান্তা বারের সম্মুখে।

ততক্ষণে ক্যাপ্টেন হুদা কিছুসংখ্যক মিলিটারী সহ এসে পৌঁছে গেছেন।

একসঙ্গে সবাই মিলে অস্ত্র বাগিয়ে ধরে কান্তা বারে প্রবেশ করে। মিলিটারীরা সমগ্র কান্তা বার ঘেরাও করে ফেলে।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ জাফরী পুলিশ বাহিনীকে কান্তা বারের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়ে নিজেরা রিভলভার উদ্যত করে প্রতিটি কক্ষে সন্ধান চালাতে শুরু করেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ সন্ধান করতে হয় না, কান্তা বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই নজরে পড়ে একটি কক্ষের সোফায় জীর্ণ ক্ষত-বিক্ষত দেহে মিঃ হেলালী বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেন না পুলিশ প্রধানদ্বয়।

তবে বেশিক্ষণ বিলম্বও হয় না চিনতে, মিঃ জায়েদীই প্রথমে বলেন—কে আপনি? মিঃ হেলালী না?

ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে বললেন মিঃ হেলালী—হাঁ আমি...... হেলালীই বটে.....আপনারা আমাকে শীঘ্র বাঁচান......

মিঃ জায়েদী মিঃ হেলালীর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন— বুঝেছি শয়তান দস্যু বনহুর আপনাকে বন্দী করে রেখেছিলো...... বলুন কোথায় সে?

মিঃ জাফরীর দু'চোখেও আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিলো। তিনি মিঃ হেলালীর করুণ অবস্থা দেখে রাগে ফেটে পড়ছিলেন। মনে করেছেন দস্যু বনহুর মিঃ হেলালীকে আটক রেখে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে। মিঃ জাফরী চিৎকার করে বলেন—কোথায় সেই নরহন্তাকারী দস্যু?

মিঃ হেলালী বললেন—দস্যু বনহুরকে আপনারা অযথা গালমন্দ করছেন। সে-ই আমাকে উদ্ধার করেছে।

মিঃ হেলালীর কথা কারো কানে গেলো না, সবাই তখন হন্তদন্ত হয়ে দস্যু বনহুরের সন্ধান করে চলেছে।

মিঃ হেলালীর পাশে দু'জন পুলিশ তাঁর সেবা করতে লাগলো। মিঃ জায়েদী, মিঃ জাফরী ও পুলিশ বাহিনী সমগ্র কান্তা বারে অনুসন্ধান করে চললো।

সমস্ত কক্ষ প্রায় শূন্য।

হঠাৎ একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে আরষ্ট হয়ে গেলেন মিঃ জায়েদী এবং মিঃ জাফরী। তারা দেখলেন সেই কক্ষমধ্যে কতকগুলো ছিন্ন মস্তক স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। একটা উৎকট গন্ধও তাদের নাকে প্রবেশ করলো। মিঃ জায়েদী এবং মিঃ জাফরী নাকে রুমালচাপা দিলেন। তারা বুঝতে পারলেন, গত কিছুদিন যাবৎ যে মস্তকবিহীন লাশগুলো কান্দাই শহরে পাওয়া গেছে সেইসব লাশের মস্তকগুলোই এখানে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে।

সুইপারের সাহায্যে ছিন্ন মস্তকগুলো গুছিয়ে রাখতেই চিনতে পারলেন এগুলো কোন্‌টা কার মাথা। এই নরমুন্ডগুলোর মধ্যে একটা রয়েছে হতভাগ্য মির্জা মোহাম্মদের। খাদ্য বিভাগীয় প্রধানের সহকারী ছিলেন তিনি।

অবশ্য মির্জা মোহাম্মদ কেমন লোক ছিলো, সে কথা সবাই জানতো। তিনি সরকারের লোক বলে সবাই তাকে একটু সমীহ করতো। কিন্তু সকলেই বিরূপ ছিলো তার উপর কারণ এই ব্যক্তি দেশের জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে খাদ্য গোপনে পাচার করতো দেশের বাইরে, তার বিনিময়ে পেতো লাখ লাখ টাকা।

শুধু মির্জা মহাম্মদই নয়, এমনি ধরনের যারা দেশের গোপন শত্রু তাদের অনেকেরই ছিন্ন মস্তক রয়েছে এই মুন্ডস্তূপের মধ্যে।

তবুতো হত্যা—তাই হত্যাকারী অপরাধী নিঃসন্দেহে। কাজেই পুলিশ বাহিনী হত্যাকারীকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না!

এসব হত্যাকান্ড যে দস্যু বনহুরেরই কাজ তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার, দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে আটকে রাখা সত্ত্বেও সে কিভাবে বেরিয়ে এলো!

মিঃ জাফরী হাঙ্গেরী কারাগারে ফোন করে আরও হতবাক হয়ে পড়েছেন। জেল প্রধান জানিয়েছেন দস্যু বনহুর ঠিক জায়গায়ই বন্দী অবস্থায় রয়েছে। পুলিশ প্রধানগণ এ সংবাদে আরও বিস্মিত হয়েছেন, তবে কার এমন দুঃসাহস যে দস্যু বনহুর নামে নিজকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে এবং এসব হত্যালীলা সংঘটিত করে চলেছে!

কান্তা বারে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও দস্যু বনহুর নামী কোনো ব্যক্তিকে পাওয়া গেলো না।

দিপালীকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তবু কোনো ফল হলো না।

মিঃ জাফরী এবং জায়েদী যখন দিপালীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তখন হঠাৎ একটি পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—স্যার, কান্তা বারের একটি কক্ষে অনেকগুলো লোক আটক রয়েছে তারা কারা এবং কে তাদের সেখানে আটক করে রেখেছে জানা যাচ্ছে না।

শোনামাত্র মিঃ জাফরী বললেন—দেখুন মিঃ জায়েদী, আমি যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। ভেবেছিলাম কান্তা বারের লোকগুলো গেলো কোথায়? সব তো আর হাওয়ায় উধাও হয়নি।

মিঃ জায়েদী সহ মিঃ জাফরী এবং আরও কয়েকজন চললেন সেই কক্ষ অভিমুখে যে কক্ষমধ্যে আটক রয়েছে কান্তা বারের কর্মচারীরা!

দিপালীও না গিয়ে পারলো না, কারণ তার মনেও নানারকম প্রশ্ন আলোড়ন জাগিয়েছে। দস্যু বনহুরই তাহলে এসব কান্ড করেছে।

পুলিশ প্রধানদের সঙ্গে দিপালীও এগুলো।

যে কক্ষমধ্যে কান্তা বারের কর্ম চারিগণকে আটক করে রাখা হয়েছে সেই কক্ষে পৌঁছে সবার চোখে বিস্ময় জাগলো। এতোগুলো লোককে একই সঙ্গে কি করে জড়ো করা হয়েছে। সবাই সংজ্ঞাহীন এবং স্তূপাকার অবস্থায় রয়েছে দেখতে পেলেন পুলিশ অফিসারগণ।

দিপালীর চোখ দুটো গোলাকার হয়ে পড়েছে। রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের এই কাজ! সে কখন কেমন করে এমনভাবে অতি সতর্কতার সঙ্গে এতোগুলো লোককে কাবু করে ফেলেছে?

দিপালীর ভাবনার শেষ নেই। সে আরও ভাবছে, রাজকুমারবেশী দস্যু বনহুর একটু পূর্বেই কান্তা বারে ছিলো, সেই বা গেলো কোথায়?

দিপালী জানালো, যারা এই কক্ষে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছে এরা সবাই দোষী। কান্তাবারের অভ্যন্তরে যে গোপন দুষ্কর্ম চলতো তার সহকর্মী এরা!

মিঃ জাফরী দিপালীকেও বাদ দিলেন না, আটক বন্দীদের সঙ্গে তাকেও বন্দী করে নিয়ে চললেন। যদিও দিপালী বলেছিলো আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

❑

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ প্রধান হাঙ্গেরী কারাগারে পৌঁছে দস্যু বনহুর ভ্রমে আটক বন্দীকে পরীক্ষা করেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, কারণ এটাই যে দস্যু বনহুর তাতে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন।

মিঃ জাফরী নিজে হাঙ্গেরী কারাগারে প্রবেশ করে এক নম্বর লৌহ কারাকক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে আছেন আরও কয়েকজন জাঁদরেল পুলিশ প্রধান এবং মিলিটারী ক্যাপ্টেন মিঃ হুদা।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রুক্ষ একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে। দীপ্ত উজ্জল নীল দুটি চোখ কেমন যেন নিষ্প্রভ উদাসীন। এগিয়ে এলো বন্দী।

মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণ নজরে তাকালেন বন্দীর মুখের দিকে। হঠাৎ মনে পড়লো কোনো একটি কথা। মিঃ জাফরী লৌহশিকের ফাঁক দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে একটানে ছিঁড়ে ফেললেন বন্দীর হাতের পাশের জামার কিছু অংশ। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো দক্ষিণ বাহুখানা। মিঃ জাফরীর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠলো, কারণ তিনি জানেন দস্যু বনহুরের দক্ষিণ বাহুতে একটি বড় জট বা আঁচলির চিহ্ন ছিলো। এর বাহুতে কোনো আঁচিল বা জট নেই।

মিঃ জাফরীর মুখোভাব লক্ষ্য করে অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিস্মিত হলেন।

মিঃ জাফরী বললেন—সর্বনাশ, আমিও শেষ পর্যন্ত এমন একটা ভুল করে বসলাম! এ দস্যু বনহুর নয়, নিশ্চয়ই এ সেই ব্যক্তি যাকে একবার ভুল করে হাঙ্গেরী কারাগারে আটক করা হয়েছিলো।

একসঙ্গে পুলিশ অফিসারগণ অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—বলেন কি, এ দস্যু বনহুর নয়?

না বললেন মিঃ জাফরী। তাঁর মুখোভাবে একটা লজ্জাসঙ্কোচ-দ্বিধা ভরা ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি পুলিশ অফিসারদের নিয়ে হাঙ্গেরী কারাগার ত্যাগ করলেন।

শাহান শাহ থেকে প্রদীপ কুমারকে দস্যু বনহুর ভ্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। মুক্তি পেলো রাজকুমার প্রদীপ।

এমন একটা অবস্থার জন্য পুলিশ মহল তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং তাঁকে জাহাজযোগে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

সন্ধ্যায় জাহাজ শাহান শাহ কান্দাই বন্দর ত্যাগ করবেন।

রাজকুমার প্রদীপকে তার ক্যাবিনে পৌছে দিয়ে বেরিয়ে এলেন মিঃ জাফরী ও তাঁর দু'জন সহকারি। ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো তাঁদের কানে।

অদ্ভুত সে অট্টহাসি! চমকে উঠলেন মিঃ জাফরী এবং তাঁর সঙ্গীরা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকালেন চারদিকে। হঠাৎ এ শব্দ কোথা থেকে ভেসে এলো বুঝতে পারলেন না তাঁরা।

জাহাজ ছাড়ার সংকেতধ্বনি হয়েছিলো, তাই পুলিশ প্রধানগণ বিলম্ব না করে নেমে পড়লেন। জাহাজখানা ততোক্ষণে কান্দাই বন্দর ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

প্রদীপ কুমার বসে ছিলো তার ক্যাবিনে। শরীর-মন দুই-ই খারাপ।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হয়ে এসেছে।

জাহাজের ক্যাবিনে ক্যাবিনে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

প্রদীপ কুমার ভাবছে তার বন্দী জীবনের দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা। দস্যু বনহুর ভ্রমে হাঙ্গেরী কারাগারে তার প্রতি কম নির্যাতন চালানো হয়নি। প্রতিদিন তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। সমস্ত দিন পর তাকে যে খাবার দেওয়া হতো তা অতি সামান্য এবং নগণ্য। অতি কষ্টে তা

গলধঃকরণ করতে হতো। কিছুদিন পূর্বে একবার তাকে এমনিভাবে বন্দী হতে হয় এবং হাঙ্গেরী কারাগারে মাসের পর মাস কত না কষ্ট পোহাতে হয়েছিলো। আবার তার ভাগ্যে সেই ভুলের পালা—সেই নির্যাতন, সেই অন্যায় অবিচার......

হঠাৎ একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো তার কানে জাহাজখানা তখন বন্দর ত্যাগ করে অনেক দূর সরে এসেছে। প্রদীপ কুমার ফিরে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো সে। জমকালো পোশাকপরা সেই ছায়ামূর্তি, যাকে সে বহুদিন পূর্বে দেখেছিলো। আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আপনি! হাঁ, আমি দস্যু বনহুর।

প্রদীপ কুমারের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে, সে সহসা কিছু বলতে পারলো না। যদিও সে কিছু বলতে চাইছিলো কিন্তু গলাটা যেন রুদ্ধ হয়ে এসেছে ভিতর থেকে।

দস্যু বনহুর এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একখানা হাত রাখলো, একটু হেসে বললো—কুমার বাহাদুর, আমি দুঃখিত যে, পুলিশ মহল বারবার একই ভুল করে অযথা আপনাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। আপনার দুর্ভাগ্য, কারণ আপনি হুবহু আমারই মত দেখতে।

প্রদীপ কুমার কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন, সে পূর্বের মতোই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—পুলিশ মহল এবার নিজেদের ভুলের জন্য নাক-কান মলেছে, আর কোনোদিন এমন ভুল আর হবে না।

এবার প্রদীপ কুমার কথা বললো—আমি পুলিশ মহলকে বিশ্বাস করি না।

সে কথা অবশ্য সত্য কিন্তু মনে হয় আর তাদের এমন ভুল হবে না, কারণ তারা ডায়রীর পাতায় লিখে রেখেছে দস্যু বনহুরের দক্ষিণ বাহুতে......বলে বনহুর নিজের হাতের জামার অংশ তুলে ধরে বললো—এই জটের কথা উল্লেখ করা আছে, কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত।

প্রদীপ কুমার দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর আসন গ্রহণ করে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর একমুখ ধোঁয়া ত্যাগ করে বললো—আপাততঃ আমি আপনার সঙ্গে আছি।

প্রদীপ কুমারের মুখমণ্ডলে একটি দীপ্ত খুশিভরা ভাব ছড়িয়ে পড়ে। বলে প্রদীপ কুমার—আপনি সঙ্গে থাকলে অনেক খুশি হবো।

দস্যু বনহুরকে পেয়ে প্রদীপ কুমার সত্যিই খুশি হলো, কারণ প্রদীপ কুমার জানে দস্যু বনহুর তার কোনো ক্ষতি করবে না বরং তাকে সহায়তা করবে। বেশ কিছুদিন হাঙেরী কারাগারে বন্দী থেকে প্রদীপ কুমার হাঁপিয়ে পড়েছিলো। দেহের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও তার দুর্বল হয়ে পড়েছিলো অনেকটা।

কান্দাই থেকে মন্থনা দীপ বহুদূরের পথ। প্রায় তাকে জাহাজ শাহান শাহে কাটতে হবে। কাজেই এ অবস্থায় বনহুরকে পাশে পাওয়া তার পক্ষে সৌভাগ্য বলা যায়।

বনহুর আপন মনে সিগারেট পান করছিলো। তার পাশেই আর একটি আসনে বসে আছে প্রদীপ কুমার।

ক্যাবিন নিস্তব্ধ।

শুধু জাহাজের একটানা ঝকঝক শব্দের সঙ্গে সাগরবক্ষের জল রাশির উচ্ছল শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রদীপ কুমার আন মনে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

বনহুর হঠাৎ বলে উঠলো—প্রদীপ কুমার, আপনি আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট, তাই নয় কি?

প্রদীপ কুমার ফিরে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে—না না, আমি মোটেই অসন্তুষ্ট নই, কারণ আপনি এ ব্যাপারে দোষী নন। বরং আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করি এজন্য।

প্রদীপ কুমারের কথায় বনহুরের মুখমণ্ডল খুশিতে ভরে উঠলো, বললো—সত্যি!

হাঁ।

বনহুর প্রদীপ কুমারের সঙ্গে হাত মিলালো।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের। জেগে উঠতেই অনুভব করলো পাশে কেউ নেই। ভাল করে হাতড়িয়ে দেখলো তার অনুমান মিথ্যা নয়, সমস্ত ক্যাবিন অন্ধকার।

বনহুরের বেশ মনে আছে, সে এবং প্রদীপ কুমার যখন ঘুমাবার জন্য বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে পড়ে তখন ক্যাবিনে ডিমলাইট জ্বলছিলো। কিন্তু এখন ক্যাবিনে কোনো আলো নেই। আলো নিভলো কেমন করে আর প্রদীপ কুমারই বা গেলো কোথায়?

বনহুর বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

আজ এক সপ্তাহ হলো তারা এ ক্যাবিনে আছে। প্রতিদিন রাতে পাশাপশি শোয় ওরা। কত কথা হয় ওদের দু'জনের মধ্যে। প্রদীপ কুমার এবং দস্যু বনহুরের মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব জমে উঠেছে। প্রদীপ কুমার তার মনের কথা বলেছে বনহুরের কাছে। বনহুর মনোযোগ সহকারে শুনেছে সব কথা।

বনহুর হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলো, কিন্তু আলো জ্বললো না।

বনহুর ভাবলো বাথরুমে যায়নি তো? তাই সে ডাকলো— প্রদীপ কুমার...প্রদীপ কুমার...

কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ এলো না।

কয়েক মিনিট পায়চারী করলো বনহুর, তবে কি সে ক্যাবিনের বাইরে কোথাও গেছে?

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন প্রদীপ কুমার ফিরে এলো না তখন বনহুর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। সমস্ত জাহাজ অন্ধকার, শুধু সার্চলাইটের তীব্র আলোর ছটা সাগরবক্ষে রশ্মি বিস্তার করে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডেকের ধারে এসে দাঁড়ালো বনহুর, চারিদিকে নিকষ অন্ধকার। আকাশে দু'চারটে তারা মিটমিট করছে।

অপূর্ব না হলেও আকাশটা মনোরম মনে হচ্ছিলো। কালো শাড়ীর মাঝে যেন জড়ির বুটি গুলো ফুটে উঠেছে।

বনহুর বেশিক্ষণ ডেকের ধারে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সে নিজের মনে। আজ এক সপ্তাহ কেটে গেলো এ জাহাজে কিন্তু এমন তো ঘটেনি কোনোদিন। আজ সমস্ত জাহাজ এমন অন্ধকার কেন আর প্রদীপ কুমারই বা গেলো কোথায়? ফিরে এলো বনহুর ক্যাবিনে। অন্ধকারেই হাতড়িয়ে সিগারেট কেসটা হাতে তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে গুজলো বনহুর, তারপর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একটা সোফায় বসে পড়লো। প্রদীপ কুমারের অনেক কথাই মনে আলোড়ন জাগালো। বলেছিলো সে, তার বাবা-মা এবং স্ত্রী তার জন্য উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠেছে। কারণ সে প্রায় পুরো দু'মাস আটক ছিলো হাঙ্গেরী কারাগারে। এতোদিন সে কেন দেশে ফিরে যায়নি জানে না কেউ। সে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই টেলিগ্রাফ করে দিয়েছিলো, আমি সুস্থ আছি এবং অচিরেই দেশে ফিরে আসছি। প্রদীপ কুমার আরও বলেছিলো তার টেলিগ্রাফ পেয়ে নিশ্চয়ই তার বাবা-মা এবং স্ত্রী মীরা উন্মুখ প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।

বনহুরের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো। প্রদীপ কুমারের কোনো বিপদ ঘটেনি তো। সে এমনই ঘুমিয়ে পড়েছিলো যার জন্য এতোটুকু টের পায়নি ও গেলো কোথায়।

বনহুর ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনের দিকে পা বাড়ালো। ক্যাপ্টেন তার টেবিলে বসে একটা ম্যাপ দেখছিলেন। সম্মুখে দিকদর্শন যন্ত্রে বিরাট আকার মেসিনটা দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর ক্যাপ্টেনের কাঁধের উপর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সম্মুখের দিকে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বললো—ক্যাপ্টেন।

চমকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন মিঃ হুর্ড্। কারণ এতো রাতে কে এলো তাঁর ক্যাবিনে।

ক্যাপ্টেন ফিরে তাকাতেই বললো বনহুর—জাহাজখানা অন্ধকার কেন জানতে পারি কি?

ক্যাপ্টেন পুনরায় ম্যাপে মনোযোগ দিয়েছিলেন, তিনি ম্যাপখানার উপর দৃষ্টি রেখেই বললেন—মেইন সুইচ নষ্ট হয়ে গেছে।

বনহুর বললো—আলো জ্বলবে কখন?

মেইন সুইচ ঠিক হলেই আলো জ্বলবে।

কিন্তু কখন ঠিক হবে?

যতক্ষণ না মেরামত হয়। যান ক্যাবিনে বসে থাকুন গে।

ক্যাপ্টেনের নীরস ব্যবহারে বনহুর ক্ষুদ্ধ হলো না। সে ফিরে এলো ক্যাবিনে। ইচ্ছা করেই সে প্রদীপ কুমার সম্বন্ধে কোনো কথা বললো না বা কিছু জিজ্ঞাসা করলো না।

ক্যাবিনে আসতেই দপ করে আলো জ্বলে উঠলো। সমস্ত জাহাজ-খানা আলোকিত হলো। বনহুর ডিমলাইটের সুইচ অপ করে পাওয়ার ফুল আলো জ্বালালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বিছানার দিকে, কোনো কিছু নজরে পড়ে কিনা। হঠাৎ বালিশের পাশে নিচে একটি ছোট রুমাল তার নজরে পড়লো।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রুমালখানা তুলে নিলো হাতে। রুমালখানা হাতে নিতেই বুঝতে পারলো সেই রুমালখানায় ক্লোরফরম মাখানো আছে। নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজের নাক ঢাকলো বনহুর, তারপর ডান হাতে সেই ছোট রুমালখানা মেলে ধরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। এক কোণে একটি রেশমী সুতার ছোট ফুল এবং অপর কোণায় ডি, আর, দুটি মাত্র ইংরেজি শব্দ। বনহুর বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই প্রদীপ কুমারকে কে বা কারা ক্লোরফরম অবস্থায় ক্যাবিন থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু যাবার সময় তার রুমালখানা ভুলবশতঃ ফেলে গেছে।

বনহুর রুমালখানা প্যান্টের পকেটে রেখে ফিরে দাঁড়াতেই একটা নারীকণ্ঠের অট্টহাসি ভেসে এলো তার কানে।

চমকে উঠলো বনহুর।

একি আশ্চর্য, নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি......বনহুর বিস্মিত হলো, বেরিয়ে এলো সে ক্যাবিনের বাইরে। এদিক ওদিক তাকালো কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না।

চারিদিকে এখন আলো ঝলমল করছে, সব নজরে পড়ে।

বনহুর ফিরে এলো পুনরায় ক্যাবিনে। সমস্ত মন জুড়ে গভীর একটা রহস্যময় চিন্তাধারা তোলপাড় করতে লাগলো।

আর ঘুমাতে পারলো না বনহুর, সমস্ত রাত সিগারেটের পর সিগারেট পান করে চললো। এ্যাসট্রের মধ্যে জমে উঠলো অর্ধদগ্ধ সিগারেটের স্তূপ।

ভোর হলো এক সময়।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করে সুন্দরভাবে হাতমুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলো, তারপর ফিরে এলো ক্যাবিনের মধ্যে। তোয়ালে দিয়ে মুখ-খানা মুছে নিয়ে তাকালো সম্মুখে যেখানে প্রদীপ কুমারের জামা-কাপড় ঝুলছে।

পরে নিলো সে প্রদীপের পোষাকগুলো। ক্যাবিনের আয়নার সম্মুখে দেখলো সে একেবারে প্রদীপ কুমার বনে গেছে। তার চেহারার এতোটুকু পার্থক্য নেই যে সে প্রদীপ কুমার নয়।

এমন সময় বয় এসে খাবার দিয়ে গেলো।

বনহুর খাবার খেলো, তারপর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিয়ে বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। ডেকের ধারে এসে দাঁড়ালো, দৃষ্টি তার সম্মুখে সাগরবক্ষে সীমাহীন জলরাশির দিকে।

জাহাজখানা আর এক সপ্তাহ পর মন্থনা দ্বীপে এসে পৌছবে। কিন্তু একি বিভ্রাট হলো, প্রদীপ কুমারকে কে বা কারা উধাও করলো।

বনহুর সিগারেট পান করছে আর ভাবছে, একটা নারীকণ্ঠের অট্টহাসি গতরাতে তাকে শুধু চমকেই তোলেনি, বিস্মিতও করেছে। নিশ্চয়ই কোনো রহস্যময় মায়াচক্র জড়িয়ে আছে সেই হাসির সঙ্গে। বনহুর সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তার নজরে পড়লো দুটি তরুণী ওদিকে রেলিংয়ে ঠেশ দিয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এরা হিন্দল থেকে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ জাহাজখানা যখন কান্দাই থেকে ছাড়ে তখন এ তরুণীদ্বয় জাহাজে ছিলো না। অবশ্য এ জাহাজে প্রায় বারো-তেরোজন মহিলাযাত্রী ছিলো পূর্ব হতেই। একটি তরুণীর সঙ্গে ইতিমধ্যে তার পরিচয় ঘটেছিলো। তরুণী তার বিধবা মাকে নিয়ে সিমলাই যাচ্ছে। জাতিতে তারা মারাঠা। মেয়েটি শিক্ষিতা, কাজেই সে মারাঠা ভাষা ছাড়াও সুন্দর ইংরেজি বলতে পারে। ওর নাম সিমকী, সুন্দর স্বচ্ছস্বাভাবিক ওর চালচলন।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো টেলিভিশন ক্যাবিনে। তারপর প্রায়ই সিমকীর সঙ্গে দেখা হতো জাহাজের ডেকে। বনহুর সিগারেটের ধোঁয়ার ফাঁকে তাকিয়ে আছে আড়নয়নে—মেয়ে দুটি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলো।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো ওরা।

বনহুর দেখলো দু'জন তরুণীর মধ্যে একজন সিমকী, অপরজন নতুন মেয়ে!

নতুন মেয়েটির সঙ্গে হাসছিলো সিমকী। আর কি যেন বলাবলি করছিলো। হয়তো সমুদ্রে জলরাশির উচ্ছল তরঙ্গ নিয়েই আলাপ হচ্ছিলো দু'জনার মধ্যে।

বনহুর ওদের দেখেও না দেখার ভান করে রইলো। আপন মনে সে সিগারেট পান করে চলেছে।

সিমকী আর নতুন তরুণী চলে গেলো ওদিকে।

বনহুর এবার কিছু ভেবে নিলো, তারপর পা বাড়ালো ক্যাবিনের দিকে। কিন্তু ক্যাবিনে প্রবেশ করে সে আসন গ্রহণ করতে পারলো না, একটা অস্বস্তি তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সে পুনরায় বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে আসতেই তার পায়ের কাছে একখানা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা এসে গেঁথে গেলো। থমকে দাঁড়ালো বনহুর, তারপর উবু হয়ে ছোরাখানা তুলে নিলো সে হাতে। আশ্চর্য হয়ে দেখলো ছোরার বাঁটে ছোট একটি কাগজের টুকরা বাঁধা রয়েছে।

বনহুর ছোরার বাঁট থেকে কাগজের টুকরাখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে। ততে স্পষ্ট লেখা আছে—

প্রদীপ কুমার, বন্ধুকে হারিয়ে বেশ
চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাই না?
কিন্তু আপনার বন্ধু স্বাভাবিক
মানুষ নয়। তার পরিচয় আপনি
জানেন না। জানলে তাকে পাশে
আশ্রয় দিতেন না। আপনি অযথা

মন খারাপ করবেন না। তাকে
আমি কৌশলে বন্দী করেছি।
আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী—

'চন্দনা'

বনহুরের ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। সে বার দুই চিঠিখানা পড়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে রেখে ফিরে যায় ক্যাবিনে।

পুনরায় চিঠিখানা বের করে মেলে ধরে চোখের সম্মুখে, তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো হাঃ হাঃ হাঃ করে।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর কিন্তু ফিরে তাকিয়েই বিস্মিত হয়—তার পিছনে সিমকী সঙ্গিনী সহ দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর মনোভাব চেপে নিয়ে একটু হেসে বলে—ও আপনি!

সিমকীই জবাব দেয়—হাঁ, আমি সিমকী। এলাম আমার বান্ধবীকে নিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। কিন্তু আপনার বন্ধুকে দেখছিনা তো?

বনহুর পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—বন্ধু! হাঁ আমিও কিন্তু ওকে দেখছি না। হয়তো জাহাজের কোথাও থাকবে! বসুন মিস সিমকী।

সিমকী ও তার বান্ধবী আসন গ্রহণ করলো। বললো সিমকী—এ আমার বান্ধবী চঞ্চল।

বনহুরও আসন গ্রহণ করে বললো—চমৎকার নামটা ওর। হয়তো উনি খুব চঞ্চল, তাই...

হাঁ, ঠিকই বলেছেন মিঃ প্রদীপ কুমার, ছোটবেলায় আমার বান্ধবী অত্যন্ত চঞ্চল ছিলো কিনা। কিঁরে, অমন চুপ করে আছিস্ কেন, কথা বল্ কিছু।

হেসে বললো বনহুর—আপনার বান্ধবীকে দেখে কিন্তু মোটেই চঞ্চলা মনে হচ্ছে না। বড্ড সাধু মেয়ে বলেই...

বনহুরের কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলে উঠে সিকমী—আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল মিঃ প্রদীপ কুমার। যাক, এবার আমরা কেন এলাম তাই বলি'?

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই বলুন'?

আমার বান্ধবী কিন্তু আপনার বন্ধু মিঃ আলমের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। আপনারা দু'জন একই চেহারার, একই কণ্ঠে, একই...

চট করে বলে উঠে চঞ্চলা—একই মনের মানুষ। তাই আমি চাই আপনাদের দু'জনের সঙ্গে পরিচিত হতে, বিশেষ করে আরও এক সপ্তাহ যখন আমরা একই জাহাজে আছি।

বনহুর বললো—এটা তো সৌভাগ্যের কথা। আপনাদের মতো সঙ্গী পেলে আমরা ধন্য হবো। জানিনা আমার বন্ধু আলম এতোক্ষণ আসছে না কেন।

চঞ্চলা বললো—নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কাজে তিনি গেছেন বলে মনে হচ্ছে।

বললো বনহুর—হয়তো তাই হবে। অবশ্য সে আমাকে না বলেই গেছে কিনা।

সিমকী বললো—আচ্ছা মিঃ প্রদীপ কুমার, আপনারা মন্থনা দ্বীপেই যাচ্ছেন তো?

হাঁ, মন্থনার মহারাজ আমার পিতা, মহারাণী আমার মাতা, মীরা আমার...বুঝতেই পারছেন আমি সেখানেই যাচ্ছি।

কিন্তু আপনার বন্ধু মিঃ আলম বলেছিলেন মন্থনা দীপ পর্যন্ত নাও যেতে পারি।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো বনহুরের সিকমীর কথায়, বললো—তাই নাকি? আমার বন্ধুর মনে তাহলে অন্য রকম ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু আমি ভাবছি সে গেলো কোথায়? এতোক্ষণও না আসার কারণ কি?

এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে বনহুর নিজকে প্রদীপ কুমার বানিয়ে নিলো, সিমকী বা চঞ্চলা একটু বুঝতে পারলো না যে, সে প্রদীপ কুমার নয়।

নানা রকম গল্পসল্পের পর বিদায় নিলো সিমকী আর চঞ্চলা। বনহুর গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। প্রদীপ কুমারকে যারা উধাও করেছে তারা যেই হোক এই তরুণী দু'জন তাদের দলে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং প্রদীপ কুমারকে এই জাহাজেরই কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বনহুর এ জাহাজে সন্ধান চালাবে, কাজেই এই তরুণীদ্বয়ের সঙ্গে প্রদীপ কুমারের অভিনয় করে ওদেরকে তার প্রতি নিঃসন্দেহ রাখতে হবে।

বনহুর ক্যাবিনের জানালার ফাঁকে তাকিয়ে রইলো সীমাহীন জলরাশির দিকে। বারবার প্রদীপ কুমারের মুখখানা ভেসে উঠতে লাগলো তার মনের পর্দায়। বেচারার চেহারাটাই হলো তার কাল। পুলিশ মহল তাকে একবার নয়, দু'বার আটক করে কতো নাকানি চুবানি খাওয়ালো। তারপর আবার তার জন্য এলো নতুন বিপদ। প্রদীপ কুমার ভ্রমে সে রেহাই পেলো আর বিপদ এলো প্রদীপ কুমারের জন্য। তাকে রাতের অন্ধকারে ক্লোরফরম করে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু কেন, কি উদ্দেশ্য রয়েছে এর পিছনে? কে সেই নারী যার হাস্যধ্বনি তাকে বিস্মিত করেছে। সিকমী না চঞ্চলার কণ্ঠের সে হাস্যধ্বনি ছিলো? বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

কে যেন কাঁধে হাত রাখলো বনহুরের।

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর।

সিমকী দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর বললো—আপনি!

হাঁ, এক্ষুণি গেলাম অথচ পুনরায় ফিরে এলাম। আশ্চর্য হচ্ছেন বুঝি?

না।

জানেন কেন এলাম?

একা একা আছি, তাই আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো হাসি-গল্পে পরিপূর্ণ করতে......

না, এসেছি একটা কথা বলতে।

বসুন।

এখন নয়, পরে বসবো। শুনুন মিঃ প্রদীপ কুমার।

মিষ্টার বাদ দিয়ে বললেই বেশি খুশি হবো।

আচ্ছা তাই বলবো। দেখুন, আমার বান্ধবী স্বাভাবিক মেয়ে নয়! সে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই এ জাহাজে এসেছে। ওর কথাবার্তা, চাল-চলন আমার মোটেই পছন্দ হয় না। আপনি যতটুকু পারেন ওকে এড়িয়ে চলবেন। সিমকী এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠলো বনহুরের, রহস্যজালটা যেন ক্রমান্বয়ে আরও ঘনীভূত হচ্ছে। বনহুর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

❑

বনহুর ক্যাবিনের বিছানায় চীৎ হয়ে শুয়ে ভাবছিলো। তাকে বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছিলো প্রদীপ কুমারের বৃদ্ধ বাবা-মা আর স্ত্রী মীরার কথা। তারা বিপুল আগ্রহ নিয়ে ভাবছে ক'দিন পরই আসবে তাদের প্রিয় প্রদীপ কুমার। কতদিন পর তাকে ফিরে পাবে ওরা কিন্তু তা হলো না। মন্থনা দ্বীপে পৌঁছিবার পূর্বেই হারিয়ে গেলো সে আবার এ রকম কোনো বিপদ যাতে না ঘটে, এ জন্যই বনহুর এসেছিলো তাকে নিরাপদে মন্থনায় পৌঁছে দেবে বলে। কে জানতো ওর জন্য এমনি একটা বিপদ ওঁৎ পেতে ছিলো জাহাজ শাহান শাহের মধ্যেও। আছ দু'দিন হলো নিখোঁজ হয়েছে প্রদীপ কুমার। বনহুর গোপনে জাহাজ খানার অনেক জায়গায় সন্ধান করেছে কিন্তু কোথাও প্রদীপ কুমারে চিহ্ন খুঁজে পায়নি। আশ্চর্য, কে বা কারা তার পাশ থেকে প্রদীপ কুমারকে উধারও করলো অথচ সে একটুও টের পায়নি......

বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো।

কি ভাবছেন প্রদীপ কুমার?

আপনি!

হাঁ এলাম! বললো চঞ্চলা।

বনহুর উঠে বসলো, তাকালো সে চঞ্চলার দিকে। একটা উচ্ছল ভাব ছড়িয়ে আছে তার চোখে মুখে, বললো বনহুর—বসুন।

চঞ্চলা বসলো।

বললো বনহুর—আপনার বান্ধবীকে দেখছিনা তো?

ও আসেনি বলে আপনার বুঝি খারাপ লাগছে?

না না, তা লাগবে কেন। তবে আপনারা দু'জন একসঙ্গে সব সময় জোড়া পাখির মত থাকেন কিনা, তাই......

আচ্ছা প্রদীপ কুমার?

বলুন?

আপনার বন্ধুর জন্য বড্ড চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাই না?

হাঁ...একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বনহুর, তারপর বলে—জানি না সে কোথা গেলো। যদি তাকে আর খুঁজে না পাই তাহলে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না।

সত্যি, আপনার বন্ধুর অন্তর্ধানে আমিও দুঃখিত। হঠাৎ তিনি এভাবে নিরুদ্দেশ হলেন......কথা শেষ না করে চুপ হয়ে যায় চঞ্চলা।

বনহুর কোনো কথা বলে না, সে মুখ নিচু করে কিছু ভাবতে থাকে।

চঞ্চলা বলে—প্রদীপ কুমার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সঠিক জবাব দেবেন?

বলুন, নিশ্চয়ই দেবো।

আপনি আমার বান্ধবী সিমকীকে কাছে পেলে খুশি হন বুঝি?

হাসলো বনহুর, কেনো জবাব সে দিলো না।

চঞ্চলা বলে উঠে—আপনাকে বলতেই হবে, সত্যি আপনি সিম্‌কীকে ভালবাসেন কিনা?

এবার বললো বনহুর—সামান্য দু'চার দিনের পরিচয়। এ জাহাজে আমরা সবাই মুসাফির মাত্র, কাজেই এখানে এ ধরনের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে......

আপনি বিবাহিতা?

হাঁ।

কি যেন ভাবলো চঞ্চলা, তারপর বললো—সত্যি আপনাকে আমার বড্ড ভাল লাগে।

এ আমার সৌভাগ্য মিস চঞ্চলা।

জানেন আমার বান্ধবী সিম্‌কী কি বলে?

কি বলেন উনি?

আপনি নাকি ওকে ভালবাসেন।

বনহুর মৃদু হাসে।

কই, কথা বলছেন না তো?

কি বলবো?

সিমকী আপনাকে ভালবাসে সত্যি?

হয়তো বাসে, যেমন আপনার ভাল লাগে।

দেখুন প্রদীপ কুমার, ওকে মোটেই বিশ্বাস করবেন না।

কারণ?

কারণ সে সম্পূর্ণ ছলনাময়ী।

মিস চঞ্চলা।

হাঁ প্রদীপ কুমার।

কেন? ভ্রুকুঁচকে জিজ্ঞাসা করলো বনহুর।

চঞ্চলা সরে আসে আরও কাছে—এর পূর্বে সে একজনকে ভালবাসতো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও সে ফাঁকি দিয়েছে। বলুন তো কতো নীচ সে!

বনহুর গম্ভীরভাবে চঞ্চলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো—আপনি কাউকে ভালবাসেননি মিস চঞ্চলা?

বিশ্বাস করুন আমি ভালবাসার মত আজও কাউকে খুঁজে পাইনি।

তাই নাকি?

হাঁ।

বড় আফসোস, আজও আপনি আপনার মনের মত মানুষ খুঁজে পাননি।

কিন্তু আপনাকে আমার বড় ভাল লেগেছে।

বললাম তো এ আমার সৌভাগ্য।

দেখুন আপনিও মন্থনার রাজকুমার আর আমিও ধনকুবের হিমেন্দু নাথের কন্যা। যদিও আপনি বিবাহিতা তবু আমি আপনাকে ভালবাসবো। ভালবাসা অপরাধ নয়......চলি, কেমন?

আচ্ছা আসুন।

বেরিয়ে যায় চঞ্চলা।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে ভাবে, এ যে আর একটি রহস্যজালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো সে। চঞ্চলা আর সিম্‌কী এরা দু'বান্ধবী এবং এরা দু'জনই মন্থনা দ্বীপবাসিনী। এরা জানে, সেই মন্থনার রাজকুমার প্রদীপ। প্রদীপ কুমার আর এদের গন্তব্য স্থান হলো একই জায়গায়। বনহুর যেন বিপদে পড়লো, তার অনিচ্ছা সত্বে সে যেন একটা গভীর রহস্যজাল জড়িয়ে পড়ছে।

যখন জাহাজ শাহান শাহ্ মন্থনা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবে তখন প্রদীপ কুমারকে নেবার জন্য আসবে তার বাবা-মা, স্ত্রী মীরা কিন্তু কোথায় সেই প্রদীপ কুমার! কে সেই নারী যে তাকে দস্যু বনহুর ভ্রমে হরণ করেছে? কি উদ্দেশ্য আছে বা ছিলো তার?

বনহুর ক্রমে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে।

বেরিয়ে আসে সে বাইরে, ডেকের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ সমুদ্রে তরঙ্গায়িত জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ নয়নে, তারপর পা বাড়ায় সে সিমকীর ক্যাবিনের দিকে।

সিমকীর ক্যাবিনের নিকটে পৌঁছতেই ক্যাবিনের মধ্য হস্তে ভেসে আসে অদ্ভুত এক নারীকণ্ঠ। থমকে দাঁড়ায় বনহুর, তাকিয়ে থাকে ক্যাবিনের বন্ধ দরজার দিকে। নারীকণ্ঠ কিন্তু স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন লাগছে। কি বলছে, কে বলছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ পিছনে পদশব্দ হতেই বনহুর আড়ালে আত্নগোপন করলো।

এগিয়ে এলো সিমকী আর চঞ্চল, ওরা দু'জন হাসি-গল্প করতে করতে ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়ালো। বনহুর ঐ মুহূর্তে ক্যাবিনের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা শুনতে পেলো না।

চঞ্চলা সিমকীর সঙ্গে কথা শেষ করে নিজের ক্যাবিনের দিকে চলে যায়।

সিমকী দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেলো, সে প্রবেশ করলো ভিতরে। চাপাকণ্ঠে কি যেন কথাবার্তা হলো মা ও মেয়ের মধ্যে, বনহুর ঠিক বুঝতে পারলো না।

সে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ক্যাবিনের দরজায়— ভিতরে আসতে পারি?

সিমকীর গলা শোনা গেলো—নিশ্চয়ই, আসুন আসুন।

বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

সিমকী দীপ্ত উজ্জ্বল মুখে অভ্যর্থনা জানালো—প্রদীপ কুমার আপনি!

হাঁ, এলাম আপনার মার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

সিমকী হেসে বললে—পরম সৌভাগ্য আমাদের। ক'দিন হতেই আপনাকে বলেছি চলুন আমার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই কিন্তু আপনি এখন নয় তখন, তখন নয় কাল করে সময় কাটিয়েছেন।

তারপর মাকে লক্ষ্য করে মারাঠা ভাষায় বললো—এসো মা এসো, ইনি হলেন মন্থনার রাজপুত্র প্রদীপ কুমার।

দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বৃদ্ধা।

সিমকী বলে—ইনি আমার মা মিসেস এ্যানিসা।

বনহুর ওকে ঠিক বৃদ্ধার অনুকরণে প্রণাম জানালো, তারপর হেসে বললো—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অনেক খুশি হলাম।

সিমকী বললো—আমার মা ইংরেজি জানে না, কাজেই সে আপনার কথা মোটেই বুঝতে পারছে না। ধন্যবাদ, আমি আমার মাকে আপনার কথাটা বুঝিয়ে বলছি।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো সিমকীর মার মুখে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি। সে যেন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

সিমকী মারাঠা ভাষায় তার মাকে বনহুরের কথাটা বুঝিয়ে বললো। ওর মার মুখ হাস্যোদীপ্ত হয়ে উঠলো। সেও মারাঠা ভাষায় কিছু বললো।

বনহুর তার এক বর্ণও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলো না। কারণ সে মারাঠা ভাষার সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিলো না।

সিমকী মায়ের কথাগুলো বুঝিয়ে বলে, কতকটা দোভাষীর কাজ করে সে।

কিছু সময় কাটে তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে, এক সময় বিদায় নেবার জন্য বনহুর উঠে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধা কিছু বললো!

সিমকী বুঝিয়ে দিলো—প্রদীপ কুমার, আপনাকে দেখে আমার মা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। এই জাহাজে না এলে আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হতো না। আপনি আবার আশা করি আসবেন।

বনহুর বললো—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি নিজেও কম আনন্দিত হইনি। নিশ্চয়ই আবার আসবো।

তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করে বনহুর সিমকীর ক্যাবিন থেকে।

ফিরে এলো সে ক্যাবিনে কিন্তু তার মন জুড়ে বিরাট একটা রহস্যময় চিন্তা ঘুরপাক করতে লাগলো।

এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো সাগরের বুকে।

ক্যাবিনখানার মধ্যেও সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে এসেছে। বনহুর সিগারেট পান করতে করতে পায়চারী করছে আর চিন্তা করছে কিছু পূর্বে সিমকীর মায়ের ক্যাবিন থেকে যে নারী কণ্ঠ তার কানে এসেছিলো তারই কথা। অদ্ভুত সে নারীকণ্ঠ ছিলো, নিশ্চয়ই কোনো মেশিনের সাহায্যে সে শব্দ দূরে পাঠানো হচ্ছে বা দূর দেশের কোথাও হতে জাহাজের ঐ ক্যাবিনে আসছে। সিমকীর মা বৃদ্ধা যে গলার সুর সে শুনেছে সে স্বর তার নয়। সে মুহূর্তে সিমকীও ছিলো না ক্যাবিনের ভিতরে। তবে কি ব্যাপার.........

বনহুর গভীরভাবে ভাবছে, ঐ সময় আধো অন্ধকারে এসে দাঁড়ায় একটি ছায়ামূর্তি তার ক্যাবিনে।

বনহুর ফিরে তাকিয়ে বলে উঠে—কে?

আমি সিমকী।

ও।

কই, ভিতরে আসতে বলছেন না তো?

এই তো এসেছেন।

অন্ধকারে কেন?

ও তাই তো......বনহুর সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই সিমকী ওর হাতখানা ধরে ফেলে—না থাক।

বনহুর অবাক হয়।

সিমকী বলে—অন্ধকার বেশ লাগছে।

কিন্তু.........

যদি কেউ এসে পড়ে, এই তো?

তা তো নিশ্চয়ই, কারণ আপনি নারী আমি পুরুষ, আমার ক্যাবিনে আপনাকে এই অন্ধকারে দেখলে সবাই......

আঁতকে উঠবে, না?

ঠিক আঁতকে নয়।

তবে?

কতকটা বিস্মিত হবে বলতে পারেন।

এ আপনার মনের দুর্বলতা।

হয়তো তাই।

প্রদীপ কুমার।

বলুন?

আপনার অনুমতি পেলে বসতে পারি।

নিশ্চয়ই বসুন, তবে আমার মনে হয় আলোটা জ্বালালে ভাল হয়। আপনার মাও তো এসে পড়তে পারেন?

ও আপনাকে ভাবতে হবে না। সিমকী আসন গ্রহণ করতে করতে কথাটা বলে।

বনহুরও আর একটি আসনে বসে পড়ে কতকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও। হঠাৎ অসময়ে সিমকীর আগমন তার মোটেই পছন্দ হয়নি, তবু মনোভাব গোপন রেখে বলে—আপনার মা খুব ভাল।

দেখুন মাও কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অনেক ভাল বললেন। মাকে যাই মনে করুন মা কিন্তু আসলে বড্ড লোভী।

তার মানে?

মানে আপনি রাজকুমার তারপর বিবাহিত তবু আমার মায়ের লোভ পড়েছে আপনার উপর, যা কোনোদিন আমাদের মত মেয়ে আশাই করতে পারে না। জানেন মা কি বলেছে আপনার সম্বন্ধে?

কি বলেছেন?

যদি আপনার মত একটি ছেলে সে জামাই হিসেবে পেতো।

ও, এই তাঁর লোভ? হাসে বনহুর।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বনহুরের হাসির শব্দ ক্যাবিনটাকে মনোরম করে তোলে।

সিমকী অভিভূত হয়ে পড়ে।

বলে সিমকী—মার বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর লোভ...সত্যি যা কোনোদিন সম্ভব নয় তাই সে আশা করে।

মিস সিমকী, আমার চেয়েও সুন্দর এবং গুণবান জামাই আপনার মা পেতে পারেন, কাজেই আশা করাটা তার পক্ষে অসম্ভব নয় মোটেই।

কিন্তু আমি জানি কোনোদিন সে আশা পূরণ হবে না! প্রদীপ কুমার, ভালবাসা কি পাপ? আমি যদি আপনাকে ভালবাসি তা কি অন্যায় হবে?

না।

সত্যি বলছেন?

সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার।

কিন্তু আপনি?

একটু হাসির শব্দ শোনা গেলো, বললো বনহুর—মাত্র ক'দিনের পরিচয়, এর মধ্যে আপনি আর আমি কতটুকু ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে পারি? হয়তো এরপর আর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ নাও ঘটতে পারে।

যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে সবই সম্ভব। প্রদীপ কুমার, সত্যি আপনার জন্য আমি নিজকে উজাড় করে দিতে পারি। আপনি কি আমার জন্য একটুও আপনার ভালবাসা দিতে পারেন না?

এর জবাব আজ নয়, আর একদিন দেবো মিস সিমকী।

সত্যি, আপনিই এক পুরুষ যাকে আমি নতুন করে আবিষ্কার করলাম। কোনো লোভ মোহ নেই আপনার মধ্যে। অদ্ভুত মানুষ আপনি।

সিমকী কথাগুলো বলে নিজেই সুইচ টিপে আলো জ্বালালো!

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো—চলুন ডেকে গিয়ে দাঁড়াই।

সিমকী বললো—চলুন।

বনহুর আর সিমকী ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় জাহাজের ডেকে রেলিংয়ের পাশে।

এ দিকটায় তেমন কোনো লোকজন ছিলো না। বেশ নিরিবিলি। খানিক দূরে কয়েকজন যাত্রী নারীপুরষ ডেকের ধারে বসে বসে হাসিগল্প করছিলো।

বনহুর আপন মনে সিগারেট থেকে ধূম্র নির্গত করে চলেছে।

সিমকী বললো—আচ্ছা প্রদীপ কুমার, আপনার বন্ধু আলমের নিরুদ্দেশ সংবাদ ক্যাপ্টেনকে জানিয়েছেন কি?

বনহুর সিমকীর মুখে তাকালো, বললো—না, প্রয়োজন মনে করিনি।

প্রদীপ কুমার, আপনি কি বন্ধুর জন্য চিন্তিত হননি?

নিশ্চয়ই হয়েছি।

তাহলে কি করে নিশ্চুপ রইলেন?

জানি তাকে খুঁজে পাবো না।

আচ্ছা প্রদীপ কুমার, আপনি মনে করেন আপনার বন্ধু আলম এ জাহাজে নেই?

এ ব্যাপারে আপনি যেমন ভাবছেন আমিও ঠিক তেমনি ভাবছি।

দেখুন আপনাকে দেখে মনে হয় বন্ধুর জন্য আপনি মোটেই চিন্তিত নন।

এ কথা সত্যিই, কারণ বন্ধুর জন্য চিন্তা করে কোনো ফল হবে না, তাই......

সত্যি আপনি আমাকে হাসালেন, কেউ কোনোদিন এমন কথা বলে না।

চলুন মিস সিমকী ঐ ভদ্রলোকদের সঙ্গে বসে আলাপ করিগে।

কেন, এখানে বুঝি ভাল লাগছে না আপনার?

তা লাগছে বইকি কিন্তু ওদের সঙ্গে বসে আলাপ করলে মন্দ কি?

ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আপনার?

জাহাজে আসার পর যাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে কিন্তু আপনার মত অন্তরঙ্গতা হয়নি কারো সঙ্গে।

এমন সময় ৮নং ক্যাবিনের যাত্রী দু'জন এসে দাঁড়ায়, ওরা স্বামী-স্ত্রী মিঃ আর এ চৌধুরী ও তার স্ত্রী মিসেস চৌধুরী।

মিঃ চৌধুরী আর মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিলো বনহুরের জাহাজে আসার তৃতীয় দিনে। ভদ্রলোক ভারি অমায়িক লোক। তেমনি তার স্ত্রী মিসেস চৌধুরী জাহাজের প্রথম ক্লাসের ৮নং ক্যাবিনের যাত্রী তাঁরা, তাই গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিলো ৩নং ক্যাবিনের প্রদীপ কুমারের সঙ্গে। প্রদীপ কুমার মন্থনার রাজপুত্র, এ কথা জানার পর জাহাজের অনেকেই গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসতো কিন্তু প্রদীপ কুমার তখন উধাও হয়েছে। কাজেই বনহুরকে প্রদীপ কুমারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে।

মিসেস চৌধুরী বনহুর আর সিমকীকে লক্ষ্য করে বললেন—বাঃ চমৎকার জুটি বনে গেছেন! সন্ধ্যার সমুদ্র উপভোগ করছেন বুঝি?

বনহুর হেসে বলে—হাঁ, কতকটা তাই।

মিঃ চৌধুরী বললেন—কুমার বাহাদুর, আপনার সঙ্গিনীটি নিশ্চয়ই বাঙ্গালি বলে মনে হচ্ছে না? কিন্তু...

বনহুর সিমকীর মুখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—আপনাদের অনুমান মিথ্যা নয়, আমার সঙ্গিনী মারাঠী মেয়ে কিন্তু আপনারা যা মনে করেছেন তা নয়।

মিসেস চৌধুরী বললেন—তাহলে?

জাহাজেই সঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছি......

ও তাই বলুন, উনি তাহলে মন্থনার রাজপুত্রবধু নন,—বললেন মিঃ চৌধুরী।

না। বললো বনহুর।

মিসেস চৌধুরী যেন এতোক্ষণে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। এ ক'দিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ'দের দু'জনাকে নিয়ে নানারকম তর্ক-বিতর্ক চলছে। স্বামী বলেন, রাজকুমারের স্ত্রী ঐ মেয়েটি আর মিসেস চৌধুরী বলেন, না তা নয়, ঐ মেয়েটি প্রদীপ কুমারের স্ত্রী হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এগিয়ে এসেছেন নিজ নিজ সন্দেহের সমাধান করতে।

মিসেস চৌধুরী জিতে বললেন—দেখলে কে জিতে গেলো। আমি ঠিক বলেছি না, ও মেয়েটি প্রদীপ কুমারের স্ত্রী হতে পারে না কখনও...

মিঃ চৌধুরী বললেন—বেশ, স্ত্রী না হলেও হবে তো একদিন। আমি ঠিক বলেছি কিনা উনাকে জিজ্ঞাসা করো। আচ্ছা প্রদীপ কুমার, জাহাজের সঙ্গিনী হলেও ওকে আপনি ভাবী স্ত্রী বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন তো?

বনহুর এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—মিঃ চৌধুরী, আপনি পরাজিত হয়েছেন আপনার স্ত্রীর কাছে, কারণ আমি বিবাহিত। কাজেই এ ধরনের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

এবার মিঃ চৌধুরীর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, তিনি আড়নয়নে স্ত্রীর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই মিসেস চৌধুরী বললেন—দেখলে তো কার জিত হলো? এবার চলো।

মিঃ চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরী চলে গেলেন।

বনহুর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মিস সিমকী এতোক্ষণ হা করে ওদের কথাবার্তা শুনছিলো, এবার বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—উনারা কি বলছিলেন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে?

ও! ওঁরা বলছিলেন তরুণী আপনার কে হন?

আপনি কি বললেন?

বললাম আমার বোন হন উনি।

সিমকী এতে তেমন খুশি হলো বলে মনে হলো না বরং মুখটা একটু গম্ভীর হলো।

বনহুর বললো—মিস সিমকী, সত্যি বলতে কি আমার বোন নেই, আপনি যদি আমার বোন হতেন এবং সব সময় আপনি আমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসতেন তাহলে কত না খুশি হতাম।

সিমকী গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো, তারপর বললো—বেশ, তাই হোক।

হাঁ, আপনি আমাকে ভাই বলে ডাকবেন, আর আমি আপনাকে ছোট বোন বলে গ্রহণ করবো।

আচ্ছা, সেই ভাল।

সিমকী বিষণ্ণ মুখে ফিরে যায় তার নিজের ক্যাবিনের দিকে।

বনহুর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো এতোক্ষণে।

সিমকী চলে যেতেই একটি নারীমূর্তি বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে।

চমকে না উঠলেও একটু হকচকিয়ে গেলো বনহুর, কারণ মেয়েটি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। মেয়েটির মুখে আলো পড়তেই বনহুর তাকে চিনতে পারলো সে চঞ্চলা। বনহুর কিছু বলবার পূর্বে চঞ্চলা বললো—প্রদীপ কুমার, সত্যি আপনি ওকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলেন।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো চঞ্চলার দিকে।

চঞ্চলা বললো আবার—কই, জবাব দিচ্ছেন না যে?

বললো বনহুর—আপনার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অহেতুক, তাই।

মানে?

মানে তাকে আমি ফিরিয়ে দেইনি বরং তাকে বোনের মর্যাদা দিয়েছি।

সত্যি আপনি অদ্ভুত মানুষ।

কতকটা তাই।

প্রদীপ কুমার, আমি জানতাম আপনি সিমকী মেয়েটাকে ভালবাসতে পারেন না।

ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকায় বনহুর চঞ্চলার দিকে— কেন?

তা আপনি নিজেই জানেন। যাক সে কথা, কেন এলাম এবার বলি।

বলুন?

কিন্তু কথাটা অত্যন্ত গোপনীয়।

আমি গোপনতা রক্ষা করবো।

যা বলবো তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আপনার কাছে। কিন্তু একটি শর্ত আছে।

বলুন কি শর্ত?

ঠিক আপনি আমার কথামতো কাজ করবেন?

যদি আমার রুচিমতো হয় নিশ্চয়ই করবো।

প্রথমে কথা হলো সিমকীর সঙ্গে আপনি প্রেমের অভিনয় করবেন এবং ঘন ঘন যাবেন তাদের ক্যাবিনে!

তারপর?

আপনি জানতে পারবেন কে সিমকী আর কে তার মা......

হঠাৎ বুকে হাতচাপ দিয়ে আর্তনাদ করে উঠে চঞ্চলা, সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ে যায়।

বনহুর ওকে ধরে ফেলতেই দেখতে পায় চঞ্চলার পিঠে বিদ্ধ হয়ে আছে একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। ছোরাখানা যে কখন এসে বিদ্ধ হলো, টেরই পায়নি বনহুর।

চঞ্চলার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে অদূরে ডেকের ধারে বসে গল্পেরত যাত্রীদল শশব্যস্তে ছুটে আসে সবাই। ঘিরে দাঁড়ায় বনহুর আর চঞ্চলাকে।

তখন বনহুরের হাতের উপর ঢলে পড়েছে চঞ্চলার দেহখানা। পিঠ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে বনহুরের হাত দুটো ভিজে জপজপে হয়ে উঠেছে।

সবাই এই দৃশ্য লক্ষ্য করে হতভম্ব হয়ে গেলো যেন।

কারো মুখে কোনো কথা সরছে না।

বনহুর ডাকলো, মিস চঞ্চলা, একি হলো! কে আপনাকে এভাবে ছোরাবিদ্ধ করলো? বলুন, বলুন মিস চঞ্চলা?

চঞ্চলার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠে কিন্তু কোনো কথা বলতে পারে না। মাথাটা ঢলে পড়ে বনহুরের বুকের একপাশে।

বনহুর ওকে শুইয়ে দেয় ডেকের উপর এবং শুইয়ে দেবার পূর্বে তার পিঠ থেকে ছোরাখানা অপর একজনকে তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

ততোক্ষণে সিমকী আর তার মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পড়ে সেখানে, উভয়ের চোখে উত্তেজনার ছাপ। তারা ব্যস্ত এবং ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—কে একে এভাবে হত্যা করলো?

বনহুর একবার তাকালো ওদের দু'জনার মুখের দিকে, কোনো জবাব সে দিলো না।

অল্পক্ষণে ক্যাপ্টেন এবং জাহাজের অন্যান্য কর্মচারী ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে। সকলের চোখেমুখে ভীতি ও উত্তেজনার ছাপ।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি রাজকুমার? একি কান্ড হলো?

বনহুর ক্যাপ্টেনকে বললো—আমি সম্পূর্ণ এ ব্যাপারে অজ্ঞ। আমরা দু'জন ডেকের ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, হঠাৎ সেই মুহূর্তে কোথা হতে এর পিঠে ছোরা এসে বিদ্ধ হলো আমি কিছু বলতে পারলাম না।

জাহাজে এ ব্যাপার নিয়ে ভীষণ একটা চঞ্চল এবং ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। সমস্ত জাহাজে তল্লাশি চালিয়েও এর কোনো ক্লু আবিষ্কার হলো না।

মৃতদেহ একটি ক্যাবিনে বরফ দিয়ে রাখা হলো, কারণ মন্থনায় না পৌঁছানো অবধি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হলো না।

বনহুর ছোরাখানা সবার অলক্ষ্যে সরিয়ে ফেলেছিলো, সে ক্যাবিনে গিয়ে ছোরাখানা তুলে ধরলো চোখের সামনে। এ সেই একই ধরণের ছোরা যে ছোরা ক'দিন পূর্বে তার পায়ের কাছে গেঁথে গিয়েছিলো, যে ছোরার বাটে গাঁথা ছিলো একটি ছোট্ট চিঠি। যে বনহুর ভ্রমে প্রদীপ কুমারকে সরিয়ে নিয়েছে, সে-ই চঞ্চলার হত্যাকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রদীপ

কুমারের হরণকারী এবং চঞ্চলার হত্যাকারী যে এ জাহাজেই আত্নগোপন করে আছে তা সঠিক বুঝতে পারলো বনহুর।

ছোরা দু'খানা সে তার বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখলো, তারপর ফিরে দাঁড়াতেই একটি নারীকণ্ঠের অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো ক্যাবিনের মধ্যে।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সম্মুখের শার্শী দিয়ে জাহাজের ডেকে। অদ্ভুত এ নারী, যে তার চোখেও ধুলো দিয়ে জাহাজেই লুকিয়ে আছে কিন্তু কে সে?

বনহুর আপন মনে পায়চারী করে চললো। ভাবছে বনহুর, চঞ্চলাকেই তার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিলো, হয়তো ছোরা নিক্ষেপকারিণী সেই হবে কিন্তু আসলে সে নয়, তবে কে সেই নারী......

বনহুর পায়চারী করতে লাগলো।

নারীকণ্ঠের অট্টহাসির শব্দটা যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। আজ পর্যন্ত এমন কোনো নারী বা পুরুষ নেই যে, তার চোখকে ফাঁকি দিয়েছে। কে এই অট্টহাসির অধিনায়িকা যে বনহুর ভ্রমে প্রদীপ কুমারকে উধাও করলো এবং বেচারী চঞ্চলাকে হত্যা করলো? নিশ্চয়ই চঞ্চলা তাকে এমন কিছু বলতে যাচ্ছিলো যা বলবার পূর্বেই তাকে নিঃশেষ করা হলো। সিমকী আর তার মা, কে এরা? সত্যি কি এরা মারাঠা জাতি?

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে চঞ্চলার মুখখানা। কি নির্মম সে মুহূর্তটা। চঞ্চলা ভাবতেও পারেনি কয়েক সেকেন্ড পর সে এ পৃথিবীতে আর থাকবে না। বরফের চাপের নিচে রাখা হয়েছে ওকে কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেও সে গরম গরম কাপড় শরীরে ধারণ করেছিলো। বনহুর ভাবছে কত কথা, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সেই কি দায়ী......

ঐ মুহূর্তে একটি ছায়ামূর্তি সরে গেলো জানালার পাশ থেকে। বনহুর বেশ বুঝতে পারলো ছায়ামূর্তি কোনো নারী, পুরুষ নয়। বনহুর দ্রুত জানালার পাশে এসে উঁকি দিলো গলা বাড়িয়ে। স্পষ্ট দেখতে পেলো ছায়ামূর্তিটা দ্রুত চলে গেলো ক্যাপ্টেনের কামরার দিকে।

বনহুর কিছুক্ষণ ভাবলো এখন তার কি করা কর্তব্য। ছায়া-মূর্তিটাকে ফলো করে কোনো লাভ হবে কি? না, এ মুহূর্তে নয়।

ফিরে আসে বনহুর নিজের আসনের পাশে।

❑

সমস্ত রাত বনহুর গোপনে সন্ধান করে চলে যেখানে যেখানে এবং যাকে যাকে তার সন্দেহ হয়েছিলো। সবশেষে সিমকীর ক্যাবিনের পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্যাবিনের মধ্যে কোনো সাড়াশব্দ নেই। এক মিনিট দু'মিনিট করে কাটে দু' ঘন্টা। না, ভিতর থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

বনহুর এমন জায়গায় আত্মগোপন করে আছে যেখানে কারো নজর পড়বে না। তবু বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে এগিয়ে যায় বনহুর সেই ক্যাবিনটার দিকে, যে ক্যাবিনে চঞ্চলার মৃতদেহ বরফচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

ক্যাবিনটার পাশে এসে দাঁড়াতেই বনহুরের বুকটা নিজের অজান্তে দুলে উঠলো। চঞ্চলাকে সে ভুল বুঝেছিলো, কেমন যেন সন্দেহ এসেছিলো ওর উপর কিন্তু আসলেই কি চঞ্চলা সন্দেহহীনা ছিলো? যদি সে সম্পূর্ণ নির্দোষ হবে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে কেন? কে এই চঞ্চলা যার মধ্যে লুকোন ছিলো কোনো একটা গোপন রহস্য। বনহুর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে এ ক্যাবিনে কোনো সাড়া পাওয়া যায় কিনা।

না, বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও কোনো শব্দ সেই ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো না। মৃত ব্যক্তি তো আর কথাও বলবে না বা হেঁটেও বেড়াবে না, তবে কিসের শব্দের প্রতীক্ষা করছিলো বনহুর সে নিজেই জানে।

বনহুর নিজের ক্যাবিনে ফিরে আসবার জন্য পা বাড়ালো। তাকে সিমকীদের ক্যাবিনের সম্মুখ হয়েই আসতে হবেই।

যেমনি বনহুর সিমকীদের ক্যাবিনের সম্মুখে এসেছে অমনি একটা শব্দ তার কানে এলো, সেই অদ্ভুত নারীকণ্ঠ। কেমন যেন কথাগুলো অস্পষ্ট ধরনের।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে চট্ করে ক্যাবিনের পিছনে এসে একটি থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। কান পাতে সে ক্যাবিনের পাশে। ক্যাবিনের মধ্যে জমাট অন্ধকার। পাশেই জানালা, কিঞ্চিৎ ফাঁক থাকা সত্বেও ক্যাবিনের ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না! অতি চেষ্টা করেও বনহুর শব্দগুলোর এক বর্ণও বুঝতে পারলো না।

কণ্ঠ সিমকীর নয়, এতে কোনো ভুল নেই। তবে সিমকীর মায়ের কণ্ঠ বলেও মনে হলো না। বনহুর ফিরে এলো ক্যাবিনে, সে বুঝতে পেরেছে, ঐ শব্দটা কোনো ওয়্যারলেসে দূর থেকে ভেসে আসা নারী কণ্ঠস্বর।

বনহুর নিজকে প্রস্তুত করে নিলো। তাকে এই গভীর রহস্যের সমাধান করতেই হবে। আজ মনে পড়লো কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। এবার কান্দাই ফিরে একটি দিনের জন্য সে বিশ্রাম গ্রহণ করবার সুযোগ পায়নি। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজ করছিলো। চারিদিকে অন্যায়-অনাচার-অবিচার-শোষণ-নিষ্পেষণ চলছিলো। জনগণ এক চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছিলো। এ কারণে তাকে অক্লান্ত চেষ্টা চালাতে হয়েছে। একদল নরপশুর নির্মম আচরণে জনগণ হাঁপিয়ে উঠেছিলো, তাদেরকে দমন করতে হয়েছে তাকে। তার প্রচেষ্টা বিফল হয়নি, চোরাচালানী দল সম্পূর্ণ বিনাশ না হলেও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। কান্দাইবাসীদের মনে ফিরে এসেছে শান্তি আর আনন্দ। তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি দেশবাসী, কারণ এখনও দেশের মধ্যে আত্নগোপন করে আছে অনেকগুলো নেত্রীস্থানীয় নরপশু, যারা সরকারের সহকারী হিসেবে দেশবাসীর মঙ্গলের অভিনয়ের আড়ালে করে চলেছে তাদের সর্বনাশ।

বনহুর এদের সন্ধান জানলেও তাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেনি, কারণ সময় ছিলো না তার হাতে। প্রদীপ কুমারের বন্দী জীবন তাকে বেশ করে ভাবিয়ে তুলেছিলো। একবার নয়, দু' দু'বার বেচারা প্রদীপ শুধু তারই জন্য নাকানি-চুবানি খেয়েছে বা খাচ্ছে। একটা নিরীহ মানুষ কারাগারের কঠিন শাস্তি পেতে থাকবে আর সে আরামে দিন কাটাবে, তা হতে পারে না।

বনহুর তাই প্রদীপ কুমারের উদ্ধার ব্যাপার নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলো। প্রদীপ কুমারের মুক্তি তাকে শুধু আনন্দই দেয়নি, তার মনে এনে দিয়েছিলো একটা শান্তি, একটা নিশ্চিন্ত ভাব। বনহুর তাই রহমানের কাছে বিদায় নিয়েই রওয়ানা দিয়েছিলো প্রদীপ কুমারের সঙ্গে, পথে যেন তার আর কোনো বিপদ না আসে। বেচারার জন্য আজ তাই বেশি করে ভাবনায় পড়েছে বনহুর। কোথায় আছে সে আর কি অবস্থাতেই বা আছে কে জানে!

বনহুর সমস্ত জাহাজখানা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু প্রদীপ কুমারকে সে খুঁজে পায়নি। বড় আশ্চর্য লাগছে বনহুরের কাছে। এমনভাবে তার পরাজয় কোনোদিনই হয়নি।

কিন্তু তাকে অসীম ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করতে হবে যতোক্ষণ না জাহাজখানা মন্থনা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছে। পুরো তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, এখন মাত্র কয়েকটা দিন। এই কয়েকটা দিন কেমনভাবে কাটবে কে জানে।

চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় বনহুর। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতেই পারে না সে। হঠাৎ গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কেমন যেন একটা নীলাভ আলোকরশ্মি তার ক্যাবিনের জানালার পথে এসে পড়েছে ক্যাবিনের দেয়ালে। বনহুর দ্রুত তার শয্যা ত্যাগ করে ক্যাবিনের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। জানালা বন্ধ ছিলো, তাই বনহুর জানালার শার্শীর ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ক্যাবিনের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো আপন মনে—উড়ন্ত যান! একটি ছোট্ট উড়ন্ত যান দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের ডেকে ঠিক সিমকীদের ক্যাবিনের সম্মুখে। উড়ন্ত যান থেকে নীলাভ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে।

সিমকীদের ক্যাবিনের দরজা খোলা বলে মনে হলো। ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো সিমকীর মা।

বনহুর লক্ষ্য করছে।

সিমকীও এসে দাঁড়ালো মায়ের পিছনে।

উড়ন্ত যানটির সম্মুখে এসে সিমকীর মা সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে খসে পড়লো বৃদ্ধার ড্রেস। বনহুরের দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ে। সিমকীর মার অদ্ভুত পরিবর্তন। আসলে সে বৃদ্ধ নয়, এক অপূর্ব সুন্দরী নারী বৃদ্ধার ড্রেসের নিচে ছিলো। অদ্ভুত এক ড্রেস।

সিমকীর মা উড়ন্ত যানের দিকে এগুলো।

সিমকী নত হয়ে তাকে অভিবাদন করলো।

সিমকীর মা উড়ন্ত যানে উঠে পড়তেই যানটি ভেসে উঠলো আকাশে, তারপর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বনহুর ফিরে এলো তার বিছানার পাশে, কিন্তু শয্যা গ্রহণ করতে সে পারলো না। পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলো কেন জাহাজের মধ্যে

কোনো জায়গায় প্রদীপের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি। ঐ উড়ন্ত যানে করেই তাকে জাহাজ শাহান শাহ থেকে সরানো হয়েছে। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে? কে এই সিমকী আর সিমকীর মায়ের বেশেই বা কে সেই নারী, যে নারী আজ উড়ন্ত যানে শাহান শাহ ত্যাগ করলো?

সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটলো বনহুরের।

ভোরে সোফায় হেলান দিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করে ক্যাপটেন, তার পিছনে সিমকী।

বনহুরের নিদ্রা ছুটে যায়, সে দড়বড় করে উঠে দাঁড়ায়, চোখেমুখে বিস্ময় টেনে তাকায় সে ক্যাপটেন এবং পর মুহূর্তে সিমকীর মুখে।

ক্যাপটেন ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠে—রাজকুমার, আজ আবার এক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনা!

হাঁ, জানি না জাহাজে কি হলো। সেদিন আপনার বন্ধু হঠাৎ ক্যাবিন থেকে উধাও হলো। তারপর শাহান শাহের অন্য ক্যাবিনের যাত্রী মিস চঞ্চলার অকস্মাৎ মৃত্যু। আজ আবার মিস সিমকীর মায়ের নিরুদ্দেশ......

ক্যাপটেনের কথা শেষ হয় না, তাকায় বনহুর পুনরায় সিমকীর মুখে। সিমকী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো কিন্তু দু'চোখে তার একটা দ্যুতি খেলে গেলো, বললো—মিস সিমকীর মা নিরুদ্দেশ, বলেন কি ক্যাপেটেন?

হাঁ, সমস্ত জাহাজে তল্লাশি চালিয়েও তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। ক্যাপটেনের গলায় হতাশার সুর।

সিমকী একটা চেয়ারে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বনহুর মনে মনে হাসছে সিমকীর অভিনয় অভিজ্ঞতা তাকে অভিভূত করলো। দুঃখভরা কণ্ঠে বললো—মিস সিমকী, সত্যি আমরা সবাই দুঃখিত। হঠাৎ আপনার মা এমনভাবে নিরুদ্দেশ হবেন, আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি। আমার বন্ধুর জন্যও ঠিক আপনার মতই আমার মনের অবস্থা কিন্তু কি করবো বলুন, ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে। একটু থেমে ক্যাপটেনকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর —আপনি বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে এই অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করুন।

ক্যাপটেন বললো—আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি রাজকুমার কিন্তু সব যেন কেমন রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে। জানি না কেন এমন হলো। ক্যাপটেন কথাগুলো বলে যেমন ব্যস্তভাবে এসেছিলো তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সিমকী তখনও তেমনি বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বনহুর মৃদু হাসে।

এগিয়ে আসে সে সিমকীর পাশে, ওর কাঁধে হাত রেখে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে—মিস সিমকী, আপনি চিন্তা করবেন না, আমার মনে হয় আপনার মা ঠিকই জীবিত আছেন, হয়তো ভালভাবেই আছেন।

সিমকীর কান্না যেন বেড়ে যায়, সে বনহুরের হাতখানা টেনে নেয় দু'হাতের মুঠায়, তারপর বলে—প্রদীপ কুমার, আমি এখন কি করবো বলুন? আমার মা ছাড়া আমি একটি দিনও থাকতে পারি না। কি করবো বলুন?

মিস সিমকী, আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। মন্থনায় না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গে আছি এবং থাকবো।

সত্যি আপনি মহৎ ব্যক্তি।

মিস সিমকী, আপনার মায়ের জন্য আমি সন্ধান করবো।

সিমকীর মুখখানা কিছুটা প্রসন্ন হয়ে উঠে। সে উঠে দাঁড়ায়। বনহুরের হাতখানা তখনও তার হাতের মুঠায়, বলে সিমকী—আপনি আছেন বলেই আমি সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি প্রদীপ কুমার, নাহলে সত্যি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্নহত্যা করতাম।

তা কি করে ভাবতে পারলেন মিস সিমকী। মা বুড়ো হলে এক দিন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এটা ঠিক। তিনি না মরে উধাও হয়েছেন তাতে ভেংগে পড়ছেন কেন। চলুন আপনাকে ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সিমকী রুমালে চোখ মুছে উঠে পা বাড়ালো।

বনহুর এগিয়ে চললো ওর পাশে পাশে। ক্যাবিনে পৌঁছে বললো সিমকী—বসবেন না একটু।

আপনি যদি খুশি হন নিশ্চয়ই বসবো।

বসুন। বললো সিমকী।

বনহুর বসলো।

সিমকী বললো—রাতে আমার মা আমার পাশেই ঘুমিয়ে ছিলেন।

বনহুর বললো—ঠিক আমার বন্ধুর উধাও ব্যাপারের সঙ্গে আপনার মায়ের উধাও ব্যাপারটা যেন একই সঙ্গে জড়িত।

একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে সিমকী—হয়তো তাই হবে। প্রদীপ কুমার?

বলুন?

সত্যি মাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবো না?

নিশ্চয়ই পাবেন।

আপনি ঠিক বলছেন?

মনে হয় পাবেন।

আপনার কথা যেন সত্য হয় প্রদীপ কুমার।

বনহুর বহু নারীকে দেখেছে কিন্তু সিমকীর মত অভিনয় দক্ষ নারী সে কমই দেখেছে। বনহুর মনে মনে হাসলেও মুখোভাবে সে সম্পূর্ণ না জানার এবং না বোঝার ভান করে চললো।

❑

জাহাজ মন্থনায় পৌঁছবার পূর্বদিন রাতে বনহুর ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লো। কাল যখন বন্দরে জাহাজ ভিড়বে তখন রাজপুত্র প্রদীপ কুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এগিয়ে নিতে আসবে তার বাবা-মা স্ত্রী মীরা দেবী কিন্তু তখন সে কি করে অভিনয় করবে প্রদীপ কুমারের। না-না, তা হয় না, প্রদীপের বৃদ্ধ পিতামাতা এবং স্ত্রীকে সে ধোকা দিতে পারবে না। তবে কি সে স্পষ্ট বলবে আমি তোমাদের ছেলে প্রদীপ নই। তা বললে হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কিংবা পুত্রশোকে কোনো অঘটন ঘটতে পারে। তবু পারবে না সে এতোবড় মিথ্যা অভিনয় করতে।

হারিয়ে গেছে প্রদীপ কুমার, সেও হারিয়ে যাবে সবার অলক্ষ্যে জাহাজ শাহান শা থেকে।

সত্যিই পরদিন ভোরে বনহুরের ক্যাবিন শূন্য। সমস্ত জাহাজে ভীষণ একটা আলোড়ন শুরু হলো। রাজকুমার প্রদীপ গেলো কোথায়?

কে দেবে তার জবাব?

সিমকী তো মাথায় হাত দিয়ে ক্যাবিনের মেঝেতে বসে পড়লো। তার মুখে কোনো কথা নেই, সে যেন সম্পূর্ণ বোবা বনে গেছে। মিঃ আলম কিভাবে উধাও হয়েছে, কোথায় আছে, কেমন আছে, সব জানে সে তার মা কোথায় গেছে তাও তার অজানা নেই কিন্তু প্রদীপ কুমার গেলো কোথায়? সত্যিই সে উবে গেছে যেন।

সিমকী নিজে সন্ধান করলো সমস্ত জাহাজের সব জায়গায় কিন্তু কোথাও সে তাকে খুঁজে পেলো না।

ক্যাপ্টেন সিমকীকে সান্তনা দিতে লাগলো।

সিমকী জানালো, প্রদীপ কুমারই ছিলো তার ভরসা। মাকে হারিয়ে সে যতো ব্যথা না পেয়েছিলো তার চেয়ে বেশি ব্যথা পেয়েছিলো প্রদীপ কুমারের নিরুদ্দেশ ব্যাপারে।

বৃদ্ধ সারেঙ্গ আওরঙ্গও খবর শুনে এসে হাজির। সিমকীকে সে নিজের মেয়ের মতো মনে করতো। একদিন সিমকী আর তার মা যখন ডেকে দাঁড়িয়েছিলো তখন সারেঙ্গ আওরঙ্গ দূর থেকে তাদের দেখে এগিয়ে এসেছিলো, নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলো সে সিমকীর দিকে।

সিমকীর মা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো আওরঙ্গের এই অদ্ভুত আচরণে।

সিমকীও সেদিন কম অবাক হয়নি, সে বলেই বসেছিলো—অমন হা করে কি দেখছো আমার দিকে চেয়ে চেয়ে?

আওরঙ্গ বলেছিলো ব্যথাকরুণ কণ্ঠে—মা তোমার মত আমার একটি মেয়ে ছিলো। মেয়েটি জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলো, তারপর তাকে আর খুঁজে পাইনি। বলে হাতের পিঠে চোখ মুছে ছিলো আওরঙ্গ।

আজ সেও এসে সিমকীর পাশে দাঁড়ালো, বললো কেঁদো না মা, আমি তোমার পাশে আছি।

সময়মতো জাহাজ শাহান শাহ এসে মন্থনা দ্বীপে পৌঁছলো।

জাহাজ শাহান শাহ বন্দরে ভিড়তেই অপেক্ষমান আত্নীয়স্বজন এগিয়ে এলো যার যার আত্নীয়স্বজনকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নামিয়ে নিতে।

বন্দরে একটা আনন্দপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিলো, কারণ যার যার আত্নীয়স্বজন নিজেদের জনকে পেয়ে খুশিতে আত্নহারা হয়ে উঠেছে। নিজের নিজের জনকে বুকে জড়িয়ে আনন্দধ্বনি করছে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন মন্থনার রাজা এবং মহারাণী তাঁদের পুত্র প্রদীপ কুমারকে নামিয়ে নিতে। চোখেমুখে তাদের খুশির উচ্ছাস, কতোদিন পর তারা সন্তানকে কাছে পাবেন কিন্তু হায়রে দুরাশা, কোথায় তাদের সেই সন্তান। একটু পরেই তাঁরা জানতে পারেলেন প্রদীপ কুমার জাহাজ থেকে উধাও হয়েছে। কোথায় গেলো সে কেউ জানে না।

সংবাদ শুনে হায় হায় করে উঠলেন মহারাজ এবং মহারাণী। মুহূর্তের মধ্যে মন্থনা বন্দরে একটা শোকের হাওয়া বইতে শুরু করলো।

চঞ্চলার আত্নীয়স্বজনও এসে যখন শুনলো চঞ্চলার মৃত্যু সংবাদ তখন আরও একটা কান্নার রোল পড়লো।

সমস্ত বন্দর জুড়ে একটা অশান্তির স্রোত বয়ে চললো। জাহাজ থেকে কফিনে বরফ দেওয়া চঞ্চলার মৃতদেহ নামানো হলো।

সিমকীও এক সময় নেমে এলো জাহাজ থেকে। আওরঙ্গ কথা দিয়েছিলো, সব সময় তার সঙ্গে থাকবে তাই সিমকীর জিনিসপত্র মাথায় নিয়ে নেমে এলো সে সিমকীর পিছনে পিছনে।

অবশ্য সিমকী বলেছিলো, তুমি কেন যাবে আমার সঙ্গে আওরঙ্গ, আমি তো আর তোমার মেয়ে নই? বলেছিলো আওরঙ্গ, তুমি আমার মেয়ের মতো দেখতে, তাই তোমাকে ছাড়তে পারবো না মা আমি।

বেশ চলো কিন্তু মনে রেখো আমার সঙ্গে গেলে যা দেখবে তা কারো কাছে বলবে না।

তওবা তওবা, মেয়ের কাছে বাপ থাকবে আর মেয়ের কথা বলবে সে লোকের কাছে, কি যে বলো মা!

আচ্ছা চলো।

বুড়ো আওরঙ্গ খুশি হয়ে চললো সিমকীর সঙ্গে।

বন্দরের বাইরে বেরিয়ে এলো সিমকী। চোখে গগল্‌স, হাতে এটাচী ব্যাগ। সঙ্গে আওরঙ্গ, তার মাথায় সুটকেস আর বেডিং।

আওরঙ্গ জাহাজের সারেঙ্গ ছিলো এককালে, এখন সে শাহান শাতে খালাসির কাজ করতো। ওকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় এক সময় তার দেহখানা বলিষ্ঠ ছিলো। মাথায় ওর কাঁচা-পাকা একরাশ চুল। মুখে চাপদাড়ি। বয়সের তাড়নায় চোখেমুখে একটা ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ পড়েছে। দেখলে মায়া হয়। সিমকী তাই ওকে ফিরিয়ে দিতে পারলো না।

বন্দরের অদূরে দাঁড়িয়েছিলো একটা ঘোড়াগাড়ি। সিমকী হাত তুলে ইশারা করতেই কোচোয়ান গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে।

কোচোয়ানটা যেন সিমকীর জন্যই অপেক্ষা করছিলো।

গাড়িটা এগিয়ে আসতে সিমকী চেপে বসে! আওরঙ্গকে গাড়ির পিছনে পা-দানিতে দাঁড়াতে বলে সিমকী।

গাড়ি চলতে থাকে।

আওরঙ্গ একটু অবাক হয়, সিমকী তো তার গন্তব্যস্থানের কথা বললো না। তবে কি এ গাড়িখানা তাদের নিজের? হয়তো তাই হবে। যাক, এসব নিয়ে তারা মাথা ঘামানোর দরকার কি। যদি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়, একটু মাথা গুঁজবার আশ্রয় পায়, তাহলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবীতে ওর আপনজন বলতে কেউ নেই।

আওরঙ্গ শাহানশাহে খালাসির কাজ করে যা দু'চার টাকা পেতো তা দিয়ে কোনোরকমে পেটের খোরাকটা চলতো। পোশাক পরিচ্ছদ তার বহু পুরোন, বহুকালের। যখন সে সারেং ছিলো তখন যে কাপড় ছিলো তাই তার শরীরে, একটু বোকাটে ধরনের।

ঘোড়াগাড়ির পা-দানিতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো সে তার উপস্থিত অবস্থার কথা। পুঁটলিটা ঝুলিয়ে রেখেছে পাশের হ্যান্ডেলের সঙ্গে, ঐ পুঁটলিই তার সম্বল। ওর মধ্যে আছে তার পুরোন জামাকাপড় আর একটা ছেঁড়া কম্বল।

মন্থনা দ্বীপে কোনোদিন আওরঙ্গ আসেনি, তাই সে অবাক হয়ে দেখছিলো চারদিকে তাকিয়ে।

ঘোড়াগাড়িখানা রাজপথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সিমকী আওরঙ্গকে ডেকে বলছে—আওরঙ্গ, ঠিকমতো দাঁড়িয়ে আছো তো?

আওরঙ্গ জবাব দিচ্ছে—আছি মা, ঠিক দাঁড়িয়ে আছি।

দেখো পড়ে যেওনা যেন।

না না, পড়বো না মা, বুড়ো হলেও হাতে জোর আছে।

ওর কথা শুনে হাসে সিমকী।

ঘোড়াগাড়িখানা এপথ সেপথ ঘুরেফিরে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করলো। গলিটা কেমন যেন অন্ধকার মনে হচ্ছে।

গাড়িখানা এগুচ্ছে।

কোচোয়ান তার আসনে বসে ঘোড়া দুটোকে চালনা করছে।

পিছনের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ আওরঙ্গ।

ঘোড়াগাড়িখানা গলিপথ অতিক্রম করে বেরিয়ে এলো বাইরে। এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আওরঙ্গ। সে আজীবন সমুদ্রে মুক্ত বাতাসে কাটিয়েছে। বদ্ধ গলি তার কাছে অসহ্য।

মুক্ত প্রান্তর অতিক্রম করে গাড়িখানা এগিয়ে চললো। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সম্মুখে একটি বিরাট বন নজরে পড়লো।

গাড়িখানা সেই বন অভিমুখে এগুতে লাগলো।

আওরঙ্গ বললো—মা জি, আর কতোদূর যেতে হবে?

গাড়ির ভিতর থেকে সিমকীর কণ্ঠ ভেসে এলো—আর বেশি দূর নয় আওরঙ্গ। এইতো সম্মুখে যে বন বা জঙ্গল দেখছো সেখানে।

আওরঙ্গ মনে মনে একটু ভড়কে গেলেও মুখে সে কোনো কথা বললো না। জঙ্গলের মঙ্গে ওর বাড়ি, এ কেমন কথা!

গাড়িখানা দ্রুত ছুটছে।

এলোপাতাড়ি এবড়ো থেবড়ো পথ। গাড়িখানা বেজায় ঝাঁকুনি খাচ্ছিলো। শক্ত করেই ধরে আছে আওরঙ্গ গাড়ির পিছন হ্যান্ডেলখানা। মাঝে মাঝে যদিও সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো তবু সে যাতে পড়ে না যায় সেজন্য হুশিয়ার ছিলো সব সময়।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িখানা পৌঁছে গেলো বনের পাশে।

একটি পথ বনের মধ্যে চলে গেছে সোজাসুজিভাবে। ঐ পথে ঘোড়াগাড়িখানা চলতে লাগলো।

সিমকী আবার বললো—আওরঙ্গ, ঘাবড়ে যাচ্ছো না তো? বলেছি যা দেখবে কাউকে বলবে না?

না, বলবো না কাউকেই।

হাঁ, সব সময় মনে রাখবে এ কথাটা এবং সে কারণেই তোমাকে আমি সঙ্গে এনেছি।

সব মনে আছে আমার মা। বললো আওরঙ্গ।

সিমকী গলা বাড়িয়ে কথা বলছিলো, এবার সে সোজা হয়ে বসে।

দু'পাশে গহন বন, মাঝখান দিয়ে সরু পথ। বনের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশে সক্ষম নয়। একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে বনটার মধ্যে।

কিছুদূর এগিয়ে একটা পোড়োবাড়ি নজরে পড়লো। ঠিক পোড়ো-বাড়ি নয়, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

গাড়িখানা সেই মন্দিরের সম্মুখে এসে থামলো। নেমে দাঁড়ালো সিমকী, আওরঙ্গও নেমে পড়েছে, সে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে চারিদিকে।

সিমকী হেসে বললো—-খুব আশ্চর্য হয়ে গেছো, তাই না? এটাই আমার বাড়ি। তুমি থাকবে আমার কাছে কাছে, কেমন?

একটা ঢোক গিলে বললো আওরঙ্গ—আচ্ছা। চোখেমুখে তার বিস্ময় ও ভয় ফুটে উঠেছে। সে কোনোদিন বনজঙ্গলে আসেনি। এটাই তার প্রথম বনের মধ্যে আসা, কাজেই একটু ঘাবড়ে যাবার কথাই বটে।

সিমকী বললো—ক'দিন থাকলেই অভ্যাস হয়ে যাবে আওরঙ্গ। এসো আমার সঙ্গে।

মন্দিরের ভাঙ্গা দরজা পেরিয়ে ভিতরে চলে গেলো সিমকী। আওরঙ্গ তাকে অনুরসণ করলো।

কোচোয়ান গাড়ি নিয়ে ফিরে চললো আবার।

সিমকী ভাঙ্গা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আওরঙ্গকে লক্ষ্য করে বললো—সাবধান, কোনো কথা বলবে না।

আচ্ছা মা।

সিমকী এগিয়ে চলেছে।

যতো এগুচ্ছে আওরঙ্গ ততোই অবাক হচ্ছে, বাইরে থেকে ভাঙ্গা মন্দির দেখা গেলেও ভিতরটা ভাঙ্গা বা নোংরা নয়, সুন্দর ঝকঝকে সান বাঁধানো পথ। দু'পাশে পাথুরে দেয়াল। দেয়ালে এক স্থানে মশাল গোঁজা আছে। মশালের উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে চারদিক।

কিছুটা এগুতেই দু'জন অস্ত্রধারী প্রহরী পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

সিমকী হাত বাড়িয়ে অংগুরি দেখাতেই ওরা অস্ত্র সরিয়ে নিয়ে পথ মুক্ত করে দিলো।

আওরঙ্গ অবাক হয়ে এগুচ্ছে। সিমকী বারণ করে দিয়েছে কোনো কথা সে বলবে না, তাই সে চুপচাপ রয়েছে। যতোই এগুচ্ছে ততোই বিস্মিত হচ্ছে আওরঙ্গ। তাকে সিমকী কোথায় নিয়ে এলো।

কিছুদূর এগুতেই আরও দু'জন প্রহরী পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

সিমকী তাদের সম্মুখেও হাত বাড়িয়ে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে পথ মুক্ত করে দিলো প্রহরী দু'জন।

এক স্থানে এসে একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সিমকী এবার নিচের একটি বিরাট কক্ষমধ্যে এসে দাঁড়ালো। সেখানে অনেকগুলো জোয়ান বসে বসে অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করছিলো।

সিমকীকে দেখেই ওদের মধ্য থেকে একজন বললো—চন্দনা এসেছো? পরক্ষণেই লোকটা আওরঙ্গকে লক্ষ্য করে বললো—একে তো চিনতে পারছি না, কে এ?'

সিমকী হেসে বললো—বেচারা আমাকে ওর মেয়ের মতো দেখে মেয়ে বানিয়ে নিয়েছে। বৃদ্ধ এককালে সারেঙ্গ ছিলো, উপস্থিত খালাসির কাজ করতো। আমি ওকে নিয়ে এলাম, বড় কষ্ট ওর......

তা একেবারে গুহার অভ্যন্তরে?

অবিশ্বাসের কিছু নেই। ও খুব ভাল......শোনো হামিদ, একে রাখো, যখন রাণীর হুকুম পাবো তখন ওকে তার সম্মুখে হাজির করবো।

বললো হামিদ—একে দিয়ে কি কাজ হবে?

বড় বিশ্বাসী......জানো তো পিপীলিকাও কাজে আসে। আওরঙ্গ, তুমি এখানে বসো, বিশ্রাম করো।

আচ্ছা মা জি! বলে পাশের একটা টুলের উপর বসে পড়লো আওরঙ্গ।

সিমকী চলে গেলো।

ঠিক ওটা কক্ষ নয়, ভূগর্ভে একটি গুহা। গুহার মধ্যে নানা রকম অস্ত্র থরে থরে সাজানো। নানারকম কলকারখানা আর বিরাট বিরাট পিঁপে ভর্তি নানারকম গোলাবারুদ।

দেয়ালে নানারকম পোশাক এবং ঢাল-তলোয়ার। আরও অনেক রকম সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। আওরঙ্গ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর বারবার হাই তুলছিলো।

সিমকী সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা এগিয়ে চললো। কিছুটা সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে সে নেমে এলো আরও নিচে।

একটি বিরাট গুহাকক্ষ।

কক্ষমধ্যে সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট একটি নারীমূর্তি। সমস্ত দেহ আলখেল্লায় ঢাকা। মুখের নিচের অংশ কালো রুমালে আচ্ছাদিত।

সিমকী এসে কুর্ণিশ জানালো।

সিংহাসনে উপবিষ্ট নারীমূর্তি বললো—এসেছো?

সিমকী বললো—হাঁ রাণী, কিন্তু একটি দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ! অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো নারীমূর্তি।

সিমকী বললো—শেষ পর্যন্ত প্রদীপ কুমার নিখোঁজ।

নারীমূর্তি ইংগিত করলো যারা তখন কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়েছিলো তাদের বেরিয়ে যাবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে নারীমূর্তির অনুচরগণ বেরিয়ে গেল।

নারীমূর্তি মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললো—তীব্রকণ্ঠে বললো—প্রদীপ কুমার নিখোঁজ?

হাঁ রাণী।

আশ্চর্য......নারীমূতি আসন ত্যাগ করে সিংহাসনের পাশে পায়-চারী করতে লাগলো তার দীপ্ত সুন্দর ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠেছে।

সিমকী নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো নারীমূর্তির মুখে।

নারীমূর্তি বললো—চন্দনা, যাকে আমরা বন্দী করে এনেছি সে আসলে দস্যু বনহুর নয়।

সিমকী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—বলো কি রাণী?

হাঁ চন্দনা, জীবনে এ আমার চরম পরাজয়। আশ্চর্য, এদের দু'জনার চেহারা সম্পূর্ণ এক।

সিমকী বললো—তবে কি তুমি বলতে চাও যাকে তুমি বন্দী করে এনেছো সেই প্রদীপ কুমার?

হাঁ।

কিন্তু.......

কোনো কিন্তু নেই, যার সঙ্গে তুমি প্রেমের অভিনয় করেছিলে তিনিই স্বয়ং দস্যু বনহুর।

রাণী!

হাঁ চন্দনা।

রাণী, প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো, তার কথাবার্তা, চাল-চলন মোটেই সাধারণ মানুষের মতো ছিলো না। প্রত্যেকটা কথায় ছিলো তার অদ্ভুত এক বলার ভঙ্গী......

চন্দনা, এখন কি করবো?

জানি, এ ভুলের জন্য চরম এক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। দস্যু বনহুর আমাদের এই বোকামি লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই মনে মনে বিদ্রূপ করেছে। চন্দনা, আমি যদি পূর্বে কোনোদিন দস্যুটাকে এক নজর দেখতাম তাহলেই এমন ভুল হতো না।

রাণী, তুমি কি করে বুঝলে যাকে তুমি আটক করেছো সে দস্যু বনহুর নয়?

তার সঙ্গে কথাবার্তায় আমি বুঝেছি। কারণ দস্যু বনহুর যে সে নয়, এটা সে নিজেই তার প্রমাণ।

সত্যি, তুমি অদ্ভুত নারী রাণী—কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল তা তার কথাবার্তার মধ্যেই আবিষ্কার করে নিয়েছো। রাণী, আমার কিন্তু এখনও সন্দেহ আছে তুমিই তো ভুল করছো না?

তার মানে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকালো রাণী চন্দনার মুখের দিকে।

চন্দনা বললো—যাকে তুমি প্রদীপ কুমার বলে ভুল করছো আসলে সেই দস্যু বনহুর?

না, তেমন ভুল আমার হবে না।

রাণী, চঞ্চলার মৃত্যু...

ঐ বিশ্বাসঘাতকিনীর নাম মুখে এনো না চন্দনা। ওকে হত্যা না করলে সে নিশ্চয়ই আমার গোপন রহস্য ফাঁস করে দিতো। হাঁ, ওর মৃতদেহ এসে পৌঁছেছে?

এখনও এসে পৌঁছায়নি।

ওকে সমাধিস্থ না করে আমার হিমাগারে রেখে দিও। কোনোদিন ওর পিতা ফিরে এলে তাকে তার কন্যা ফেরত দেবো।

রাণী, তুমি সত্যি পাষাণী। যাকে তুমি নিজের হাতে হত্যা করছো, তারই মৃতদেহ কি করে তার স্নেহময় পিতার হাতে তুলে দেবে?

রাণী হঠাৎ হেসে উঠলো, অদ্ভুত সে অট্টহাসি, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—পাষাণীই শুধু নই চন্দনা যে কাজ আমি করি তা নরপিশাচিনীর চেয়েও জঘন্য। চঞ্চলার জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না।

আচ্ছা রাণী, দস্যু বনহুর তোমার কি ক্ষতি করেছে যে কারণে তুমি তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছো?

সে কথা আজ নতুন করে শুনতে চাস্ তুই?

হাঁ রাণী।

দস্যু বনহুর আমার আত্মসম্মানে আঘাত করেছে। সে মনে করে এ পৃথিবীতে তার মতো দ্বিতীয় কোনো দস্যু নেই যার সঙ্গে তার তুলনা হয়।

এ কারণেই তুমি তাকে...

হাঁ চন্দনা, আমি যতোক্ষণ তাকে বন্দী করতে সক্ষম না হয়েছি ততোক্ষণ আমার স্বস্তি নেই। এটা আমার মনের ইচ্ছা, বুঝলি?

যদিও আগে হতেই আমি বুঝেছিলাম তবু আবার নতুন করে বুঝলাম, শুনলাম তোমার মুখে।

চন্দনা, দস্যু বনহুরকে দেখিনি তবে শুনেছি মন্থনার রাজকুমার প্রদীপের চেয়েও সুন্দর। তার সেই সৌন্দর্যের মোহে সবাই আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভালবেসে ফেলে। শুনেছি সেই সুযোগ নিয়েই সে সকলের...

সর্বনাশ করে, এই তো?

সর্বনাশ না করলেও আমি বলি সে যা করে তা অন্যায়। বহু নারীর হৃদয় সে জয় করে নিয়েছে তাদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কাউকেই ধরা দেয় না। দাঁতে দাঁত পিষে বলে রাণী—নারীদের নিয়ে সে খেলা করে, এ তার চরম অপরাধ। জানিস্ চন্দনা, আমার বান্ধবী হীরা বাঈকে সে ধোকা দিয়েছে। রাজকুমারী হীরা আজও ঐ দস্যুর প্রেমে আত্মহারা। সে এখনও তার মূর্তি হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে একদিন নাকি সে ফিরে আসবে তার কাছে।

চন্দনা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে—হীরা বাঈ! কে সে হীরা বাঈ রাণী?

সিন্ধের রাজকুমারী হীরা।

সেই হীরা তোমার বান্ধবী?

হাঁ চন্দনা, ছোটবেলায় একসঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সিন্ধের এক মেলায়। যদিও সে রাজকুমারী তবু তার যে ব্যবহার আমি পেয়েছি তা কোনোদিনই ভুলবো না।

রাণী, কই ওর সম্বন্ধে তুমি তো কোনোদিন বলোনি?

একটু হেসে বললো রাণী—এতো সময় আমার হাতে কই চন্দনা।

না, ওর সম্বন্ধে তোমাকে বলতেই হবে, কারণ যে নারী দস্যু বনহুরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো অথচ তার কাছে পেয়েছে উপেক্ষা...

উপেক্ষা নয়, অবজ্ঞা বলতে পারিস্। আজ নয়, আর একদিন বলবো তোকে হীরা বাঈয়ের কথা।

মনে থাকবে তো?

নিশ্চয়ই থাকবে।

শোনো রাণী, একটা কথা তোমাকে এখনও বলা হয়নি।

কি কথা?

আওরঙ্গ নামে এক বৃদ্ধ সারেঙ্গ আমার সঙ্গে এসেছে। বেচারা বড় দুঃখী। আমাকে ও মেয়ের মতো ভালবাসে। যদি তুমি মত দাও তাহলে আমি ওকে আমার কাছে রাখতে পারি?

বেশ, তোর যদি এতো দয়া হয় রাখতে পারিস্। কিন্তু মনে রাখিস্ কোনো চালাকি-টালাকি নেই তোর ওর মধ্যে?

না না, সে সব আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তবে সঙ্গে এনেছি। বড় ভাল, বড় সহজ-সরল লোক, তাছাড়া বুড়োমানুষ।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একজন অনুচর এসে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো—রাণীজি, লাশের বাক্স এসে গেছে।

রাণী চন্দনাকে লক্ষ্য করে বললো—যাও চন্দনা, চঞ্চলার মৃতদেহ কফিন সহ হিমাগারে রেখে দাওগে।

চন্দনা কোনো কথা না বলে চলে যায়।

চমকে উঠে আওরঙ্গ, তার সম্মুখে চারজন লোক একটি কফিন বহন করে এনে রাখলো। বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো আওরঙ্গ, হঠাৎ যেন সে আঁতকে উঠে। সিমকী সেই যে চলে গেছে এতোক্ষণও ফিরেনি। কক্ষমধ্যে যারা কাজ করছিলো তারা কেউ কেউ এখনও কাজ করছে, আর কেউ কেউ চলে গেছে নিজ নিজ কাজ সমাধা করে অন্য কাজে।

আওরঙ্গ বসে বসে হাঁপিয়ে উঠছিলো, সে মাথাটা দু হাঁটুর মধ্যে গুঁজে ঝিমুচ্ছিলো। কফিন রাখার শব্দে এবং লোকজনের কথা বার্তায় তন্দ্রা ছুটে যায় তার, সজাগ হয়ে বসে। ভাবে আওরঙ্গ এ কফিন এলো কোথা থেকে। সে অবশ্য চঞ্চলার মৃতদেহের সম্বন্ধে জানতো কিন্তু চোখে সে দেখেনি, তাই বুঝতেও পারেনি কিছু।

আওরঙ্গ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো।

এমন সময় সিমকী এলো হন্তদন্ত হয়ে। তার সঙ্গে আরও দু'জন লোক।

যারা কফিন বহন করে এনেছিলো তারাও দাঁড়িয়ে ছিলো কফিনটার চারপাশে।

সিমকী বললো—কফিন উঠিয়ে নাও।

লোক চারজন পুনরায় কফিন তুলে নিলো কাঁধে।

সিমকী বললো—এসো আমার সঙ্গে।

আওরঙ্গ বলে উঠে—মা মণি, আমি বসে থাকবো?

তুমি...আচ্ছা এসো। সিমকী এগুলো তাকে অনুসরণ করলো আওরঙ্গ।

ভূগর্ভে যে এমন কারুকার্য খচিত দালান কোঠার মতো সারি সারি গুহা আছে তা আওরঙ্গ কেন, কেউ ভাবতেও পারবে না কোনোদিন। আওরঙ্গ যত এগুচ্ছে ততই বিস্মিত হচ্ছে।

নিকষ অন্ধকার এক সুড়ঙ্গ পথ।

সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হলো সেখানে একটি অদ্ভুত ধরনের গুহা। একটি পাথর দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করা ছিলো।

কফিনটা নিচে নামিয়ে রেখে গুহামুখের পাথরখানা সরিয়ে ফেললো লোক চারজন। তারপর ওরা কফিন নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

সিমকী দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে।

একটু পর ফিরে এলো কফিনের বাহক চারজন।

সিমকী বললো—তোমরা যাও, আমি আওরঙ্গকে তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

ওরা চলে গেলো।

সিমকী বললো—আমার রাণীর কাছে অনুমতি পেয়েছি আওরঙ্গ। তোমাকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। রাণী তোমাকে রাখার অনুমতি দিয়েছে। আচ্ছা আওরঙ্গ—

বলো মা জি?

তুমি কি কাজ পারবে? বুড়ো মানুষ, তোমাকে কোনো কঠিন কাজ দেবো না। হাঁ শোন আওরঙ্গ, তুমি আমার মুলকী আর রাণীর রুহীকে দেখাশোনা করবে। সব সময় ওদের কাছে কাছে থাকবে আর যত্ন করবে, কেমন?

আচ্ছা মা জি।

শোন, ওদের খাওয়া-দাওয়া তোমাকে করাতে হবে না; তার জন্য অন্য লোক আছে। সিমকী অদূরে দন্ডায়মান এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে—তিলক, একে নিয়ে যাও মুলকী আর রুহীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাওগে। যাও আওরঙ্গ......

তিলক আওরঙ্গ সহ চলে যায়।

সিমকী পা বাড়ায় অন্য পথে।

আওরঙ্গ মনে ভীষণ চিন্তা উঁকি দেয়, মুলকী আর রুহী এরা আবার কেমন মেয়ে কে জানে। তাকে কেমন চোখে দেখবে—ঘৃণা করবে না সমীহ করবে, তাইবা কে জানে। সে এসেছে একমুঠো ভাতের জন্য আর একটু আশ্রয়ের জন্য। কাজ সে পারে না, সন্ধ্যের পর চোখে দেখে না আজকাল ভাল করে। আওরঙ্গের মনে পড়ে বহুদিন আগের কথা, সে যখন জোয়ান ছিলো তখন তার স্ত্রী আর একটি মেয়ে নিয়ে কত সুখে-শান্তিতেই না ছিলো। আর এখন সে পরিশ্রম করতে পারে না, আর পারে না বলেই না সে এসেছে সিমকীর সঙ্গে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যায় আওরঙ্গ। তাকিয়ে দেখে বেশ পরিস্কার সচ্ছ আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে সে আর তিলক।

তাকিয়ে দেখলো আওরঙ্গ অদূরে পাশাপাশি দুটো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। আওরঙ্গ চারিদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো কোনো মেয়ে মানুষ দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোনো মেয়ে মানুষ নজরে পড়লো না। শুধু দুটো ঘোড়া।

তিলক বললো—তোমার নাম কি বুড়ো?

আমার নাম আওরঙ্গ।

হেসে উঠলো তিলক—আওরঙ্গজেব নাকি?

না, শুধু আওরঙ্গ বলেই আমাকে সবাই ডাকে। তুমিও ডেকো কই, মুলকী আর রুহীকে দেখছি না তো?

তুমি কি অন্ধ ঐ তো তোমার সামনে মুলকী আর রুহী।

ঐ ঘোড়া দুটোর কথা বলছো?

তা নয় তো কি ভেবেছো তুমি?

ভেবেছিলাম কোনো মেয়েমানুষ......

বুড়ো বয়সে আবার মেয়েমানুষের সখ কেন বাবা?

সখ নয়, সখ নয় বিপদ......মেয়ে মানুষ দেখলে বিপদে পড়ি, বুঝলে বাবা। তা ঘোড়া দুটোর কি করতে হবে?

দেখাশুনা করবে।

বেশ তাই হবে।

আমি চলালাম তুমি থাকো।

তিলক পা বাড়াতেই বলে উঠে আওরঙ্গ—তুমি তো চললে ভায়া কিন্তু আমার পেট যে চোঁ চোঁ করছে।

ভয় নেই, ঠিক সময় খেতে পাবে।

আচ্ছা।

তিলক চলে যায়।

আওরঙ্গ এবার ভাল করে তাকায় ঘোড়া দু টোর দিকে। একটি জমকালো একটি সাদা ধব্ ধবে যেন অমাবস্যা আর জ্যোছনা রাত। আওরঙ্গ বুঝতে পারলো, আজ থেকে এ দু'জনের দেখাশোনার ভার তারই উপর রইলো।

❑

সমস্ত দেহে শিকারীর জমকালো ড্রেস। পায়ে ভারী বুট। মাথায় ক্যাপ। কোমরের বেল্টে রিভলভার একপাশে তীক্ষ্ণ ধার ছোরা। চোখেমুখে চিন্তার ছাপ, রেশমের মত রাশিকৃত চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধে পিঠে।

পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে চন্দনা, ওর শরীরেও রাণীর অনুকরণে পোশাক। ওর কোমরের বেলটে রিভলবার এবং ছোরা। ওরা দু'জন সুড়ঙ্গ পথে ধীরে ধীরে পা রেখে এগুচ্ছিলো আর কথাবার্তা বলছিলো।

এ মুহূর্তে ওদের দেখে মনে হচ্ছিলো কোনো জরুরি কাজ নেই ওদের হাতে, তাই ওরা ধীরে সুস্থে এগুচ্ছিলো আর কথাবার্তা বলছিলো।

বললো চন্দনা—রাণী, যদি চিনতেই পেরেছো যাকে তুমি বন্দী করে এনেছো তিনি দস্যু বনহুর নন তবে কেন ধরে রেখেছো? মুক্তি দিলেই পারো!

রাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—আমার এ পরাজয়ের কথা এখনও আমার অনুচরদের কেউ জানে না, শুধু জানিস তুই আর আমি। আমার অনুচরগণ সবাই জানে দস্যু বনহুরকে আমি বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি। তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার জয়ধ্বনিতে ভূগর্ভ আস্তানা প্রকম্পিত করে তুলেছিলো! যদি তারা জানতে পারে তাদের রাণী ভুল করে আর একজনকে দস্যু বনহুর বানিয়ে বন্দী করে এনেছে......না না চন্দনা, আমি ওদের সামনে মুখ দেখাতে পারবো না। তাছাড়া ওরা জানে, ওদের রাণী কোনোদিন ভুল করতে পারে না।

রাণীর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। দস্যু বনহুরের চেয়ে সে কোনো অংশে কম নয়। বনহুরের নামে দেশবাসী যেমন আতঙ্কগ্রস্ত, তেমনি দস্যু রাণী নামেও মানুষ শিউরে উঠে। ধন কুবেরদের তো আত্মা খাঁচাছাড়া হয়।

দস্যু বনহুরের বিচরণ পৃথিবীর উত্তরাংশে আর দস্যু রাণীর বিচরণ সম্পূর্ণ দক্ষিণাংশে, কাজেই কারো সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ লাভের কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না।

মাঝে মাঝে দস্যুরাণী তার মন্থনা দ্বীপ আস্তানায় আসতো। এমনি একদিন দস্যুরাণী যখন তার মন্থনা দ্বীপ আস্তানার উদ্দেশ্যে স্থলপথে রুহীকে নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলো তখন পথিমধ্যে হীরাবাঈয়ের সংগে সাক্ষাত করাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য।

রাজকুমারী হীরাবাঈ ছিলো দস্যুরাণীর বান্ধবী! দু'বান্ধবীর মধ্যে স্বহৃদয়তা ছিলো অত্যন্ত গভীর। যদিও ওদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ কদাচিত ঘটতো।

এমনি একদিন দস্যুরাণী আর হীরাবাঈ মিলে যখন মিলিত হয়েছিলো তখন হীরার মুখে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলো। সেদিন থেকেই দস্যুরাণীর মনে একটা দারুণ ক্রোধ বেঁধে উঠেছিলো যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে সে বন্দী করবে এবং তার বান্ধবী হীরাবাঈকে অবজ্ঞা করার প্রতিশোধ নেবে। মনে মনে শপথ গ্রহণ করেছিলো দস্যুরাণী।

অবশ্য দস্যু বনহুর সম্বন্ধে দস্যুরাণী যে একেবারে অজ্ঞ ছিলো তা নয়। সে জানতো দস্যু বনহুর একজন প্রখ্যাত দস্যু। তার কার্যকলাপও কিছু কিছু কানে এসেছিলো তার কিন্তু দস্যুরাণী মনোযোগ দিয়ে শোনেনি কোনদিন বা ভাবেনি ওর সম্বন্ধে তেমন করে।

তার প্রিয়তম বিশ্ব-বিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ আহাদ চৌধুরীর মুখেও দস্যু বনহুরের কৃতিত্বের কথা শুনেছিলো তবু গ্রাহ্য করেনি দস্যু রাণী। কারণ সে জানে তার মত দস্যু এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন নেই।

এবার দস্যুরাণী চন্দনা সহ এসেছে মন্থনায়। উদ্দেশ্য তার দস্যু বনহুরকে আটক করা এবং তাকে সায়েস্তা করা।

সংবাদটা তারই প্রধান অনুচর রহমতই তাকে দিয়েছিলো। বলেছিলো রহমত—রাণীজী, কান্দাই থেকে আমাদের অনুচর জানিয়েছে দস্যু বনহুর ভ্রমে পুলিশ মহল রাজপুত্র প্রদীপ কুমারকে আটক করেছিলো এবার তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গোপনে তারা জানতে পেরেছিলো দস্যু বনহুর প্রদীপের সঙ্গে জাহাজ শাহান শাতে মন্থনা দ্বীপ অভিমুখে যাচ্ছে।

সংবাদ শোনা মাত্র দস্যুরাণীর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিলো এক অদ্ভুত দীপ্ত ভাব। জ্বলে উঠেছিলো তার চোখের তারকা দুটো জ্বল জ্বল করে। সেদিন দস্যুরাণী ভাবতে পারেনি এমনভাবে সে পরাজিত হবে দস্যু বনহুরের কাছে।

দস্যু রাণীর মুখোভাব লক্ষ্য করে চন্দনার মনটা ব্যথাকাতর হয়ে উঠলো বললো সে—রাণী, তা হলে তুমি কি করতে চাও বলো?

যতক্ষণ না দস্যু বনহুরকে আটক করতে পেরেছি ততক্ষণ প্রদীপ কুমারকে বন্দী থাকতেই হবে।

কিন্তু দস্যু বনহুরকে তুমি কোথায় খুঁজে পাবে রাণী? সেকি মন্থনায় আসবে?

না এলেও তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

রাণী তুমি না বলেছিলে তোমার বান্ধবী হীরাবাঈ সম্বন্ধে বলবে? আজ তুমি অবসর আছো বলোনা কে সেই হীরাবাঈ? আর দস্যু বনহুরের সঙ্গেই বা তার কি করে পরিচয় হলো!

একটু হেসে বললো রাণী—শুধু পরিচয় নয় চন্দনা। গভীর ভালবাসা তবে হাঁ যতটুকু আমি শুনেছি তাতে মনে হয় দস্যু বনহুরও তাকে ভালবেসেছিলো।

ভূমিকা রেখে বলোনা শুনি আসল কথাগুলো? যার জন্য তুমি এমন একটা অদ্ভুত বসানাকে চরিতার্থ করতে চলেছো?

রাণীর হাতে ছিলো একটি চাবুক।

এ চাবুকখানা হাতে নিয়ে রাণী রুহীতে আরোহণ করতো। চাবুক দিয়ে সে লাগামের কাজ করতো। রাণী চাবুকখানা দোলাতে দোলাতে ধীরে ধীরে পা ফেলছিলো। ওরা সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে সুড়ঙ্গ মুখের বাইরে এসে দাঁড়ালো। অদূরে ঘাস খাচ্ছিলো রুহী আর মুলকী।

রুহী এবং মুলকীর কিছু দূরে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো আওরঙ্গ।

সেদিনের পর থেকে আওরঙ্গ সদা সর্বদা রুহী আর মুলকীকে দেখা শোনা করে। এ ছাড়া আর কিইবা কাজ করবে সে। শক্ত কোন কাজ সে এখন পারেও না তেমন করে।

রাণী আওরঙ্গকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

চন্দনা বললো—রাণী ওর কথাই তোমাকে সেদিন বলেছিলাম। বড় ভাল লোক। বেচারীর এ দুনিয়ায় কেউ নেই...

তাতো বুঝলাম কিন্তু ওখানে বসে ও কি করছে?

রাণী তোমাকে না বলেই আমি ওকে একটা কাজ দিয়েছি। রুহী আর মুলকীকে দেখা শোনা করবে। বুড়ো মানুষ তাই...

তা বেশ করেছো ওর কোনো অসুবিধা যেন না নয়। অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো বলে রুহীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রাণী। রুহীর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো সে।

কুহী তার প্রভুকে পাশে পেয়ে আনন্দে আত্নহারা হয়ে শব্দ করতে লাগলো।

চন্দনা বললো—চলো রাণী ও পাশে ঝরণার ধারে গিয়ে বসি।

রাণী হেসে বললো—তুই হীরার কথা না শুনে ছাড়বিনা দেখছি। চল ঝরণার ধারে গিয়েই বসি।

রাণী আর চন্দনা অদূরে ঝরণার ধারে গিয়ে বসে।

চন্দনা বলে—হীরাবাঈ তোমার কেমন বান্ধবী বলো?

চন্দনা হীরা আমার প্রাণের বান্ধবী যদিও আমি আর তার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

বলোনা কেমন করে ওর সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয়?

সব তোকে বলতে হবে?

হাঁ আমি শুনবো— শুনতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে কারণ সে রাজকুমারী আর তুমি দস্যুরাণী কি করে তোমরা বান্ধবী হলে?

ঠিক বলতে কি ওর সঙ্গে আমার আচমকা পরিচয়। সেবার রায়হান বন্দর থেকে রওরানা দিয়ে আমি যখন সিওগাঁহিন্দ যাচ্ছিলাম তখন জাহাজে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হীরা আমাকে আকৃষ্ট করে ফেলে ওর মধুর ব্যবহারে। জাহাজে আমাকে প্রায় দুসপ্তাহ কাটাতে হয়েছিলো সেবার। থামলো রাণী।

চন্দনা বললো—তারপর?

যে ক'দিন জাহাজে ছিলাম দু'জনার মধ্যে একটা গভীর ভালবাসা জমে উঠেছিলো। সব সময় হীরা আর আমি একসঙ্গে থাকতাম। ও আমাকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলো—আমাকে ও মনের সব কথা বলতো। একদিন কথায় কথায় বললো সে—জানো রাণী, পুরুষ জাতকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি জিজ্ঞসা করেছিলাম—কেন, পুরুষ জাত তোমার কি ক্ষতি করেছে? বলেছিলো হীরা—সে অনেক কথা। তখন একটা গভীর বেদনার ছায়া ভেসে উঠেছিলো হীরার মুখমণ্ডলে। চন্দনা, কেন জানি না সেদিন ওর সেই ব্যথা ভরা মুখখানা আমাকে ভীষণ কাতর করে তুলেছিলো।

হীরা বলে চলেছে—বেশ কয়েক বছর আগের কথা, আমার সহচরীদের নিয়ে আমি একদিন সমুদ্রতীরে স্নান করতে গিয়েছিলাম। তখন সবেমাত্র পূর্বাকাশে সূর্যদেব উঁকি দিচ্ছে। আমার সহচরীসহ আমি উচ্ছল আনন্দে আত্নহারা হয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে সমুদ্রতীরাভিমুখে

চলেছি। সেদিন কেন যেন বড় ভাল লাগছিলো আমাকে। আমার দক্ষিণ বাহু বারবার স্পন্দিত হচ্ছিলো। আমি জানতাম, দক্ষিণ বাহু স্পন্দন কোন শুভ লক্ষণ। তাই মনে মনে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলাম। তারপর সমুদ্রতীরে পৌছলাম। ভোরের সূর্যের আলোতে সমুদ্রতীর ঝকঝক করছে। অপূর্ব সে শোভা। সমুদ্রতীরে এসে আমরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলো গেলো দূরে বালুচরে। দেখলাম একটি লোক উপুর হয়ে পড়ে আছে। ততোক্ষণে আমার সহচরীদের দৃষ্টিও গিয়ে পড়েছে সেইদিকে। আমি প্রথমে পা বাড়ালাম, চলতো দেখি লোকটা মৃত না জীবিত। গিয়ে দেখলাম একটা লোক উপুর হয়ে পড়ে আছে সে মৃত না জীবিত, বোঝা যাচ্ছে না। আমার সহচরদের আদেশ দিলাম লোকটাকে চীৎ করে ফেলার জন্য। আমার সহচরীগণ আদেশ পালন করলো। রাণী, তোমাকে কি বলবো ওকে চীৎ করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত হৃদয়ে একটা বিপুল অনুভূতি অনুভব করলাম। কারণ লোকটির মুখমণ্ডলে এক আভিজাত্যের ছাপ ফুটে আছে, বলিষ্ঠ সুন্দর দীপ্ত একটি মুখ। সে রকম সুন্দর মুখ আর হয় না। আমিই প্রথমে ওর বুকে কান রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম। দেখলাম সে জীবিত আছে। সহচরীদের লক্ষ্য করে বললাম, একে নিয়ে চল বাঁচাতে হবে। হীরা কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থেমেছিলো।

আমি তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম।

চন্দনা বলে উঠলো—যেমন আজ আমার অবস্থা হয়েছে? বলো রাণী, তারপর?

রাণী তাকিয়েছিলো ঝরণার ঝরে পড়া সচ্ছ সাবলীল জলধারার দিকে। হয়তো বা ওর চোখের সামনে ভাসছিলো হীরার সেদিনের মুখখানা। বলতে শুরু করলো রাণী—হীরা বলে চললো—সহচরীদের সহায়তায় ওকে নিয়ে এলাম রাজ অন্তঃপুরে। এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখলাম অতি সাবধানে। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম কখন ওর সংজ্ঞা ফিরে আসবে। আমি এবং আমার সহচরীগণ নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে ওর জ্ঞান ফিরে আসে। এক সময় জ্ঞান ফিরে এলো ওর। রাণী, তোমাকে কি বলবো, ওর সেই প্রথম দৃষ্টি আজও আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। অদ্ভুত নীল দুটি চোখে অন্তঃর্ভেদী দৃষ্টি সুস্থ হয়ে উঠলো ও। আমি ওকে ভালবেসে ফেললাম। আমার সহচরীদের সহায়তায় ওকে আমি রাজঅন্তঃপুরের একটি গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখলাম।

গভীর রাতে যখন সমস্ত রাজঅন্তঃপুর নিদ্রায় অচেতন থাকতো তখন আমার প্রধান সহচরী রত্না এসে আমাকে নিয়ে যেতো ওর কাছে। আমিও ওকে পেয়ে আনন্দে আত্নহারা হতাম, ভুলে যেতাম আমার অস্তিত্ব, আমি নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলতাম। রাণী, সেই মুহূর্তগুলো আমার যে কিভাবে কাটতো তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। প্রথম প্রথম রাতের বেলা আসতাম ওর কাছে, তারপর দিনের বেলায়ও আসতে শুরু করলাম।

আমি বলেছিলাম—হীরা, তোমার দুঃসাহস তো কম নয়?

বলেছিলো হীরা—ওর সঙ্গ আমাকে দুঃসাহসী করে তুলেছিলো রাণী। শুধু ওর সঙ্গে মিলিত হতেই আসতাম না। সহচরীদের সহায়তায় আমরা গোপনে ওকে নিয়ে সমুদ্রে বজরায় বেড়াতে বের হতাম। সেকি আনন্দ, ও আর আমি বজরার ছাদে বসে তাকিয়ে থাকতাম জ্যোছনাভরা সমুদ্রের দিকে। হঠাৎ দৃষ্টি আমার চলে যেতো ওর মুখে। জোছনার আলোতে অপূর্ব লাগতো ওকে। আমি সম্মোহিত হয়ে পড়তাম। রাণী, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, আমার সমস্ত হৃদয়-মন ওকে সঁপে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে আমি ধরে রাখতে পারলাম না......ফুপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো হীরা।

জানিস চন্দনা, তখন ওর জন্য আমার এতো বেশি দুঃখ হলো যে, আমি ঐ মুহূর্তে মনে মনে শপথ করলাম, বললাম—হীরা, কে সে যুবক যাকে তুমি মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করলে অথচ সে তোমাকে অবজ্ঞা করলো, উপেক্ষা করলো তোমার ভালবাসাকে। হীরার দু'গণ্ড বেয়ে তখন দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে বললো হীরা, বিদায় নেবার মুহূর্তে সে নিজের পরিচয় আমাকে জানিয়েছিলো, সে নাকি দস্যু বনহুর। চন্দনা, সেদিন দস্যু বনহুর নামটা শুনে আমার ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছিলো। ঐ নরপিশাচ হীরার সরলতা নিয়ে তার হৃদয় জয় করে পরে তাকে তুচ্ছ বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলো। এতোবড় স্পর্ধা তার। হীরার হাত ধরে আমি কথা দিয়েছি, যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে আটক করবোই এবং তাকে শায়েস্তা করবো। হীরা আজও কোনো পুরুষকে গ্রহণ করেনি, ওর ধ্যান-জ্ঞান সাধনা ঐ দস্যু বনহুর। যতক্ষণ না ওকে বন্দী করে হীরার হাতে সমর্পণ করতে পেরেছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই চন্দনা। কথাগুলো বলে থামলো রাণী।

চন্দনার মনেও একটা ভাবময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সে তাকিয়ে আছে রাণীর কঠিন দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে।

অদূরে আওরঙ্গ বসে বসে রাণী আর চন্দনার কথাগুলো শুনছিলো, যদিও সে ওদের কথাবার্তা একবর্ণ ও বুঝতে পারছিলো না!

রাণী বলে উঠে—চন্দনা, আবার আমি কান্দাই যাবো। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর ফিরে গেছে তার আস্তানায়। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

চন্দনা বলে—ততোদিন তুমি প্রদীপ কুমারকে আটক রাখবে রাণী?

এ ছাড়া কোনো পথ নেই চন্দনা। বলে উঠে দাঁড়ালো রাণী। চন্দনাও উঠে পড়লো।

❑

মিঃ হেলালী এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যদিও ডাক্তারের মতে এখনও তাঁর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, তিনি তবু কাজে নেমে পড়েছেন। মিঃ হেলালীকে সহায়তা করে চলেছেন আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

সেদিন মিঃ হেলালী পোশাক পরিচ্ছদ পরে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলেন এমন সময় একখানা গাড়ি এসে থামলো গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি থেকে নামলো একজন বোরখা পরিহিতা নারী, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। গাড়ি থেকে নেমে সোজা সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

দরজায় মোটা ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে।

বোরখা পরিহিতা দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো—ভিতরে আসতে পারি?

মিঃ হেলালী বললেন—আসুন।

মিঃ হেলালী চোখ তুলতেই চমকে উঠলেন, সম্মুখে একটি বোরখা পরিহিতা মহিলাকে দেখে অবাক হলেন তিনি।

বোরখা পরিহিতা মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হেলালী অবাক কণ্ঠে বললো—মিস দিপালী, আপনি!

হাঁ খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তাই না? বললো দিপালী।

মিঃ হেলালী বললেন—আশ্চর্য হবার কথাই বটে। কারণ মিস দিপালীকে বোরখা পরিহিতা অবস্থায় দেখে বড় নতুন লাগছে। জানিনা হঠাৎ এ অবস্থায় এখানে কি মনে করে?

দিপালী বোরখাটা খুলে ফেলে সোফার একপাশে রাখলো তারপর কক্ষের চার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—আপনি বাইরে বের হচ্ছেন নাকি?

মিঃ হেলালী বললেন—হাঁ একটু বাইরে যাবো। এবার বলুন আপনার সংবাদ কি?

সংবাদ আছে বলেই এসেছি মিঃ হেলালী। বলুন, আজ আপনার শরীর কেমন আছে?

দেখতেই পাচ্ছেন সুস্থ আছি।

কিন্তু ডাক্তার বলেছে আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।

বিশ্রামই তো এতোদিন করে এলাম মিস দিপালী। এখন কাজ করতে হবে। জানেন তো কত কাজ পড়ে আছে। যাক্, বলুন কি সংবাদ?

দিপালী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বের করে একটি খাম। খামটা বাড়িয়ে ধরে মিঃ হেলালীর দিকে।

মিঃ হেলালী খামটা হাতে নিয়ে বলেন—বসুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন?

দিপালী হেসে বললো—এতোক্ষণে বুঝি অতিথি অভ্যর্থনার কথা স্মরণ হলো?

সত্যি মিস দিপালী, আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। আজকাল সব দিক খেয়াল করে চলতে পারি না। ক্ষমা করবেন এ ভুলের জন্য।

দিপালী হাসলো।

মিঃ হেলালী ততোক্ষণে চিঠিখানা খুলে মেলে ধরেছেন চোখের সামনে। চিঠিখানাতে মাত্র কয়েকটা লাইন লেখা আছে—

"মিস দিপালী, আপনি শুধু গাড়িতে
নববধুর বেশে বসে থাকবেন।
গাড়ির ভিতরে থাকবে মালের বাক্স।
লোকে জানবে আপনি শ্বশুরবাড়ি
যাচ্ছেন। কেউ গাড়ির তল্লাশি
করবে না। জিনিস আসল জায়গায়
পৌঁছে গেলেই পাচ্ছেন দশ হাজার
টাকা। রাজি থাকলে জানাবেন?
অন্যথায় বিপদ আছে।"

'ক' 'ন' 'ক'

চিঠিখানা পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মিঃ হেলালী দিপালীর দিকে।

দিপালী বললো—চিঠিখানা আজ রাতে আমার চাকরের হাতে কে যেন দিয়ে গেছে।

আপনি রাজি আছেন কিনা জানিয়েছেন?

জানিয়েছি। এই দেখুন আমার চিঠির নকল কপি।

মিঃ হেলালী খুশি হয়ে হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ধন্যবাদ। চিঠির নকল কপিটা পড়লেন তিনি, তারপর হেসে বললেন—সত্যি, আপনি বুদ্ধিমতী নারী।

দিপালী বললো—আপনার সহায়তা কামনা করছি।

সহায়তা আমার নয়, আপনার সহায়তাই আমাকে কর্তব্যপথে উদ্বুদ্ধ করবে মিস দিপালী। আচ্ছা, আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে রওয়ানা দিচ্ছি, সেখানে মিঃ জাফরীর সঙ্গে কথা হবে।

দিপালী বললো—তাহলে চলি?

হাঁ আসুন, কিন্তু মনে রাখবেন সব কথা।

নিশ্চয়ই রাখবো। দিপালী উঠে দাঁড়ালো।

মিঃ হেলালী চিঠি দুখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো, বললো— চলুন আমার গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দি?

দিপালী হেসে বললে—ধন্যবাদ, কারণ আমি যে আপনার এখানে এসেছি, এ কথা কেউ জানে না। সে বোরখা খানা হাতে তুলে নিয়ে বললে—এটা দেখেই কি আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কেন বোরখা পরে এসেছি।

ও, সে কথা ভুলেই গেছি। আচ্ছা আপনি তাহলে......

হাঁ, আমি যাচ্ছি। দিপালী বোরখা পরতে পরতে একটু হেসে বললো—সন্ধ্যার পর আবার আসবো।

কিন্তু কেন?

পরে জানতে পারবেন। দিপালী কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো ভেলভেটের মোটা পর্দা ঠেলে বাইরে।

মিঃ হেলালী অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন তার চলে যাওয়া পথের দিকে। সিঁড়িতে দিপালীর জুতোর শব্দ মিশে যেতেই মিঃ হেলালী মাথার ক্যাপটা হাতে তুলে নিয়ে ডাকলেন—শামসু—শামসু...

ছুটে এলো বয়টা—স্যার।

বাইরে যাচ্ছি, কেউ এলে বলবি অল্পক্ষণেই ফিরে আসবো।

আচ্ছা স্যার, বলবো।

মিঃ হেলালী সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান নিচে।

ততোক্ষণে দিপালীর গাড়ি চলে গেছে।

মিঃ হেলালী নিচে নেমে আসতেই তার গভীর নীল গাড়িখানা এসে দাঁড়ালো গাড়ি-বারান্দায়। মিঃ হেলালী চেপে বসলেন।

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

মিঃ হেলালী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন, তারপর আপন মনে ভেবে চললেন তাঁর কাজের কথাগুলো। দিপালীর কিছু পূর্বে দেওয়া চিঠিখানার কথাটা ভাবছিলেন তিনি।

মিঃ হেলালী পুলিশ অফিসে গিয়েই ফোন করলেন মিঃ জাফরীর কাছে......হ্যালো মিঃ জাফরী, এক্ষুণি একবার পুলিশ অফিসে আসুন, বিশেষ জরুরি আলোচনা আছে।

মিঃ জাফরী সবেমাত্র বাইরে থেকে ফিরে বিশ্রামের আয়োজন করছিলেন, মিঃ হেলালীর ফোন পেয়ে একটু বিরক্ত হলেন বৈকি, তবু বললেন......আচ্ছা আসছি, আপনি অপেক্ষা করুন।

মিঃ জাফরী বিশ্রাম ত্যাগ করে উঠে পড়লেন।

মিসেস জাফরী ভ্রু কুঁচকে বললেন—এই তো এলে, আবার কোথায় চললে বলো তো?

মিঃ জাফরী বললেন—পুলিশ অফিসে।

তোমার কি একটু বিশ্রাম নেই?

হাসলেন মিঃ জাফরী—বিশ্রাম! আমাদের আবার বিশ্রাম আছে নাকি?

সারাটা জীবন শুধু কাজ আর কাজ নিয়েই থাকবে?

চাকরি করি, কাজ করতেই হবে। তাছাড়া এসব তো আমাদের কর্তব্য।

রেখে দাও তোমাদের কর্তব্য, একদিন তোমাদের বিশ্রাম নেই। এমন কি অসুখ-বিসুখ হলেও একদিন আরাম-বিরাম করবে না?

হেসে বললেন মিঃ জাফরী—আমি তো সুস্থ মানুষ কিন্তু অন্যদের কথা ভাবলে তুমি অবাক হবে বেগম। জানো, আমার কাছে কে এখন টেলিফোন করেছিলো।

তা আমি জানবো কি করে বলো, কে না কে তোমার কাছে ফোন করেছিলো, তুমিই জানো।

মিঃ হেলালী পুলিশ অফিসে বসে আমাকে ফোন করেছেন কোনো জরুরি কাজের ডাক এসেছে, বুঝলে?

মিঃ হেলালী তো অসুস্থ, তাঁকে ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রাম করতে বলেছেন, তবু......

হাঁ, তবু তিনি কাজে নেমেছেন আর আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর জামকাপড় পরা শেষ হয়ে যায়।

ততোক্ষণে বয় চা এনে টেবিলে রাখে।

মিসেস্ জাফরী চায়ের কাপ তুলে নিয়ে স্বামীর হাতে দেন।

মিঃ জাফরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান সমাধা করে বিদায় গ্রহণ করেন স্ত্রীর কাছে।

মিঃ হেলালী পুলিশ অফিসে বসে মিঃ জাফরীর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ততোক্ষণে অন্যান্য কয়েকজন পুলিশ অফিসার এসে গেছেন।

মিঃ জাফরী আসতেই মিঃ হেলালী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। মিঃ জাফরী আসন গ্রহণ করতেই মিঃ হেলালী বললেন—স্যার, নতুন এক সংবাদ। কট থেকে দিপালীর দেওয়া চিঠিখানা বের করে মিঃ জাফরীর হাতে দিলেন।

মিঃ জাফরী চিঠিখানা পড়ে নিয়ে বললেন—কারা এরা? যারা সুন্দরভোবে কৌশলে প্ল্যান করে কাজ করছে?

এখনও জানতে পারিনি সবকিছু। তবে মিস দিপালী আজই জানাবে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুলিশ অফিসারদের মধ্যে এসব নিয়ে গভীরভাবে আলাপ-আলোচনা চলে। এরা কারা যারা এমন একটি কৌশল নিয়েছে নববধুর গাড়িতে চোরাই মাল বাইরে পাচার করবে?

নানাভাবে আজকাল চোরাই মাল দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুলিশ মহল টেরও পাচ্ছে না। যারা পাচ্ছে বা পায় তাদের হাতে কিছু গুঁজে দিলেই বেচে যায় ওরা। দেশের এই দুর্নীতি দমনে শপথ গ্রহণ করেছে মিঃ হেলালী। তিনি পুলিশ মহলকে ক্ষমা করবেন না এ ব্যাপারে। মিঃ হেলালী বলেন, দেশকে যারা ভালবাসেন তারা দেশের প্রতিটি জনগণকে ভালবাসেন। জনগণকে ভালবাসলে তাদের মঙ্গল কামনাই হলো জীবনের ব্রত। মিঃ হেলালীর জীবনের ব্রত দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

মিঃ হেলালী মৃত্যুবরণ করবেন তবু শপথ রক্ষা করবেন।

❑

একখানা গাড়ি এসে থামলো দিপালীর বাড়ির সম্মুখে। গাড়ি থেকে নামলো দু'জন ভদ্রলোক। মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত তাদের দেহ।

দিপালী তাদের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলো। ভদ্রলোক দু'জনাকে দেখবামাত্র দিপালী এসে দাঁড়ালো গাড়ির পাশে।

লোক দু'জন দিপালীকে দেখ দীপ্ত হয়ে উঠলো।

একজন বললো—আসুন মিস দিপালী।

অপরজন গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

দিপালী গাড়িতে চেপে বসতেই লোক দু'জন উঠে বসলো তার দু'পাশে।

গাড়িখানা এ-পথ সে-পথ হয়ে ছুটে চললো। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটি হোটেলের সম্মুখে এসে থামলো গাড়িখানা।

লোক দু'জন নেমে দাঁড়ালো।

একজন খুলে ধরলো গাড়ির দরজা—আসুন মিস দিপালী।

দিপালী নামলো।

লোক দু'জন দিপালীকে নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করলো।

সুন্দর মনোরম আবাসিক হোটেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো ওরা তিনজন উপরে।

একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলো তারা তিনজন।

দিপালী তাকিয়ে দেখলো, কক্ষমধ্যে নানারকম সাজসরঞ্জাম। তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষ বসেছিলো কক্ষমধ্যে, তাদের চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। দিপালীকে দেখবামাত্র তারা খুশি হয়ে উঠে। সবার চোখেমুখে ফুটে উঠে একা উন্মুখ লালসার ছাপ।

দিপালী চমকে উঠে।

নিজকে সামলে নিয়ে বলে দিপালী—বলুন কি করতে হবে?

এবার যারা কক্ষমধ্যে অপেক্ষা করছিলো তাদের একজন বলে উঠে—আসুন কি করতে হবে আমিই বলে দিচ্ছি।

দিপালী এগিয়ে যায়।

লোক তিনজন ঘিরে দাঁড়ায় দিপালীকে।

একজন বলে—এই শাড়ী-গহনা পরতে হবে। আসুন আমি পরিয়ে দিই?

দিপালী বললো—না, আমি নিজেই পরতে পারবো।

দিপালী কথাটা বলে কাপড় এবং গহনাগুলো তুলে নিলো হাতে তারপর চলে গেলো পাশের ঘরে। একটু পরে শাড়ি-গহনা পরে নববধুর বেশে ফিরে এলো দিপালী।

ততোক্ষণে চার-পাঁচজন লোক চারটি বড় বাক্স এনে রাখলো কক্ষমধ্যে।

দিপালীর সঙ্গী দু'জনকে লক্ষ্য করে বললো কক্ষ মধ্যের বিরাট গোঁফওয়ালা লোকটি—এরা তো কাজ ফাঁস করে দেবে না মিস দিপালী?

দিপালী জিভ কেটে বললো—ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন, এরা আমার বড় আপনজন। আমার হিতাকাঙ্খী বলেই আমি এদের সঙ্গে এনেছি।

আচ্ছা তবে প্রস্তুত?

দিপালী বললো—প্রস্তুত।

চলুন তবে। লোকটা তাদের দলের একজনকে লক্ষ্য করে বললো—মদন, গাড়িতে মালগুলো তুলে দে।

বিপুলদেহী একজন এগিয়ে এলো, সে মালের বাক্সগুলো এক এক করে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এলো।

দলের নেতৃস্থানীয় লোকটা এবার দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো—মিস দিপালী, হঠাৎ যদি পুলিশ গার্ড আমাদের গাড়িখানা ধরে ফেলে তাহলে আপনি ঠিক নববধুর মতোই লজ্জা অবনত মস্তকে মৃদু কণ্ঠে বলবেন, বাক্সগুলোতে আপনার বাপের দেওয়া জিনিসপত্র আছে।

দিপালী বললো—আমাকে এতো বুঝিয়ে বলতে হবে না। এসব আমার অভ্যাস আছে। চলুন এবার কোথায় যেতে হবে? কিন্তু মনে রাখবেন সীমানার বাইরে পৌছে দেবার পরই আমার পাওনা আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

নিশ্চয়ই পাবেন মিস দিপালী।

আচ্ছা চলুন। এসো মাধু আর রাসবিহারী! দিপালী নিজের সঙ্গী দু'জনাকে ডাকলো।

ওরা এতোক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো গোবেচারীর মতো। এবার দিপালীকে অনুসরণ করলো।

চোরাচালানীদলের তিনজন এবং দিপালীর সঙ্গী দু'জন সহ পাঁচজন পুরুষ এবং দিপালী একজন নারী—এই ছ'জন গাড়িতে এসে বসলো।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

যে গাড়িতে দিপালী এসেছিলো এ-গাড়ি সে-গাড়ি নয়, এটা চোরাচালানীদের গাড়ি।

গাড়িখানা এগিয়ে চলেছে।

নববধুবেশে গাড়ির মাঝখানে বসে আছে দিপালী। তার সঙ্গীরা সবাই বসেছে পিছন আসনে।

দিপালীর বাক্সগুলো রয়েছে গাড়ির মেঝেতে।

প্রায় ঘন্টা দু'তিন অবিরাম গতিতে চলার পর গাড়িখানা সীমান্তের ধারে এসে পৌঁছলো।

ঐ মুহূর্তে সীমান্তের ওপাশে দেখা গেলো আর একখানা গাড়ি।

দিপালীর সঙ্গী দু'জন বসে আছে সম্মুখ আসনে।

চোরাচালানী তিনজন পিছন আসন থেকে ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিচ্ছিলো এতোক্ষণ। এবার তারা সীমান্তের ওপারের গাড়িখানা দেখে আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে।

একজন বলে—মিস দিপালী, ধন্যবাদ, আজ পথে কোনো পুলিশ বেটা হানা দিয়ে বসেনি।

অপর একজন বললো—এখনও গাড়ির নিকটে না পৌঁছানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

প্রথম জন বললো—ঐ তো আমাদের ওপারের গাড়ি এসে গেছে।

ড্রাইভার গাড়িখানাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে হাজির করলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও জমাট হয়ে আসেনি।

নেমে পড়লো দিপালীর সঙ্গী দু'জন।

চোরাচালানী তিনজন যেমন গাড়ি থেকে নামতে যাবে, অমনি দিপালীর সঙ্গী দু'জন পকেট থেকে রিভলভার বের করে উঁচু করে ধরলো—খবরদার, গাড়ি থেকে নামবে না।

অপরজন বাঁশীতে ফুঁ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের এপারে থেমে থাকা গাড়ি থেকে নেমে পড়লো বিশজন সশস্ত্র পুলিশ।

দিপালীর সঙ্গীদের একজন বললো—এই তিনজন চোরাচালানীকে গ্রেফতার করো।

দিপালী ততোক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছে গাড়ি থেকে।

পুলিশ ফোর্স চোরাচালানী তিনজনকে টেনে নামিয়ে ফেললো গাড়ি থেকে। ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। ভাবছে ওরা, দিপালী তাহলে আমাদের সঙ্গে চালাকি করলো। পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সে পরামর্শ করেই এসেছিলো।

দিপালী হেসে বললো—দেখুন, আপনাদের অনুরোধ রক্ষা না করে উপায় ছিলো না, কারণ আমাদের নির্দেশ পালন না করলে আপনারা আমাকে বিপদে ফেলতেন তাই......কথার মাঝপথে থেমে ফিরে তাকালো দিপালী তার সঙ্গী দু'জনার দিকে—মিঃ হেলালী এবং মিঃ জাফরী, আপনারা আমাকে এভাবে সাহায্য করে রক্ষা করলেন, সেজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ হেলালী বললেন—মিস দিপালী, ধন্যবাদ পাবেন আপনি, কারণ আপনার সহায়তায় আজ ক'জন দুস্কৃতিকারী আটক করা সম্ভব হলো।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন—মিস দিপালী, এই নিন আপনার, প্রাপ্য দশ হাজার টাকা। আপনার পুরস্কার।

দিপালী হেসে বললো—পুরস্কার পাবেন আপনারা, আমি নই। আপনাদের সহায়তা ছাড়া আমার একার কোনো উপায় ছিলো না। রেখে দিন ও টাকা, দেশের দুঃস্থ জনগণের সাহায্য তহবিলে দিয়ে দিবেন।

ততোক্ষণে পুলিশ বাহিনী চোরাচালানীদের বন্দী করে ফেলেছে।

চোরাচালানী মালসহ আটক করা হলো দুস্কৃতিকারী তিন ব্যক্তিকে।

❑

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো আওরঙ্গের। সে দড় বড় বিছানায় উঠে বসলো। সে দেখলো, তার গুহার মেঝেতে একটা নীলাভ আলোক রশ্মির আভা ছড়িয়ে পড়েছে। বিস্মিত আওরঙ্গ চিৎকার করতে যাবে অতি কষ্টে সে নিজকে সামলে নিলো। অবাক হয়ে আলোকরশ্মির দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো আওরঙ্গ। সে যে কক্ষমধ্যে ঘুমাতো সেটি আসেলে কোনো কক্ষ নয়, ছোট একটি গুহা। গুহাটির কোনো দরজায় কোনো ঢাকনা বা আবরণ ছিলো না।

আওরঙ্গ দাঁড়াতেই দেখলো, অদূরে একটি ছোট যান দাঁড়িয়ে আছে আর সেই যান থেকে নীলাভ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে। সে দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে সেই বিস্ময়কর যানটির দিকে।

আরও অভিভূত হয়ে যায় আওরঙ্গ, সে দেখতে পায় শুভ্র বসনা এক নারী মূর্তি এসে দাঁড়ায় যানটির পাশে।

তার পিছনে সিমকী এবং আরও কয়েকজন পুরুষ এগিয়ে আসে। পুরুষগুলোর দেহে জমকালো এক অদ্ভুত ধরনের পোশাক। শুভ্রবেশী নারীকে চিনতে পারে আওরঙ্গ, তাকে সেদিন সে দেখেছিলে সিমকার সঙ্গে ঝরণার ধারে। নির্বোধের মতো দেখে সে তাকিয়ে তাকিয়ে।

শুভ বসনা নারীমূর্তিকে নত হয়ে অভিবাদন জানায় তার অনুচরগণ।

নারীমূর্তিকে লক্ষ্য করে বলে সিমকী—তোমার যাত্রা যেন শুভ হয়।

রাণী সিমকীকে লক্ষ্য করে বলে—সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো চন্দনা। ফিরে না আসা অবধি আস্তানার বাইরে যাবে না।

রাণী সেই অদ্ভুত যানে আরোহণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে যানখানা ভেসে উঠলো আকাশে। অদ্ভুত সে যানটি, কোনোরকম শব্দ হচ্ছে না। যানখানা আকাশে নীলাভ আলোর কিঞ্চিৎ আভা ছড়িয়ে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আওরঙ্গ হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো আকাশের দিকে।

এমন সময় কেউ যেন ওর কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো আওরঙ্গ।

কখন যে মদন এসে তার কাঁধে হাত রেখেছে বুঝতে পারেনি সে। আওরঙ্গকে ফিরে তাকাতে দেখে বলে মদন—হা করে কি দেখছো চাচা?

এ্যাঁ, কি বললে? আওরঙ্গ যেন থতমত খেয়ে গেছে।

মদন বললো—ভয় নেই, আমাদের রাণীজী তার আস্তানায় গেলেন।

আস্তানা! কিসের আস্তানা মদন বাবাজী?

বোকা বুড়ো জানে না দস্যুরাণীর আস্তানা আছে।

কেন, দস্যুরাণীর এটাই তো আস্তানা?

না; এটা ছাড়া পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে তার আসল আস্তানা আছে। রাণীজী সেখানেই থাকেন।

জানো চাচা, রাণী এবার কেন এসেছিলেন?

তা আমি জানবো কি করে?

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন তিনি।

দস্যু বনহুর!

হাঁ তাকে চেনো না?

আমি—আমি দস্যু বনহুরকে চিনবো কি করে?

সে অনেক বড় দস্যু, বুঝলে? তাকে আমাদের রাণীজী বন্দী করেছেন।

সত্যি বলছো মদন বাবা?

হাঁ, তা নয়তো কি মিথ্যা বলছি!

দস্যু বনহুর কেমন দেখতে?

মানুষের মতো।

তাতো বুঝলাম কিন্তু কেমন তার চেহারা তাই বলছি। খুব বুঝি ভয়ঙ্কর দেখতে?

হেসে উঠলো মদন—দস্যু হলেই বুঝি খুব ভয়ঙ্কর চেহারার লোক হয়?

তাই তো আমি মনে করি।

আমাদের রাণীজীকে দেখেছো—তিনি তো দস্যুরাণী কিন্তু কতো সুন্দর তার রূপ-যৌবন, যেন অপূর্ব। তেমনি দস্যু বনহুর। কি সুন্দর তার চেহারা, যেন রাজপুত্র।

মদন বাবাজী, আমাকে একবার তাকে দেখাবে? বড় সাধ আমার দস্যু বনহুরকে একবার স্বচক্ষে দেখি।

এই সখ তোমার?

হাঁ মদন বাবা।

এসো আমার সঙ্গে।

এতো রাতে?

তাতে কি আসে যায়। আমাদের আস্তানায় রাত এবং দিন সব সমান, চলো।

আচ্ছা চলো মদন বাবাজী।

মদন এগুলো, তাকে অনুসরণ করলো আওরঙ্গ। জমাট অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। মদনের হাতে একটি মোমবাতি।

মোমের আলোতে সামান্য পথ নজরে পড়েছিলো, কেমন যেন বিভীষিকাময় লাগছিলো আওরঙ্গের কাছে। সে চিরদিন মুক্ত আলো-বাতাসে সমুদ্রবক্ষে কাল কাটিয়েছে, এমন জায়গাতো আর সে দেখেনি কোনোদিন। বারবার হোঁচট খাচ্ছিলো, দেয়ালের সঙ্গে মাথাও ঠুকে গেলো কয়েকবার।

মদন বললো—কি বুড়ো চাচা, দস্যু বনহুরকে দেখবার সখ তবু আছে?

হাঁ বাবা দেখবো। এতোবড় একটা দস্যুকে তোমাদের রাণীজী বন্দী করেছেন আমি দেখবো না? দেখবো চলো।

অনেকটা সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে এক সময় এসে পৌছে গেলো তারা লৌহ কারাকক্ষের সম্মুখে।

আওরঙ্গের চক্ষুস্থির, ভূগর্ভে এমন কারাকক্ষ সে দেখেনি কোন দিন বিস্মিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আওরঙ্গ হা করে।

মদন বলে— কি দেখছো ঐ যে ভিতরে তাকাও দস্যু বনহুরকে দেখতে পাবে।

মদনের কথায় আওরঙ্গ তাকায় কারাকক্ষের ভিতরে, চমকে উঠে আওরঙ্গ, সে দেখতে পায় এক যুবক মাথার নিচে বাহু রেখে ঘুমাচ্ছে। কারাকক্ষের স্বল্প আলোতে যুবকের চেহারাখানা স্পষ্ট নজরে পড়ে।

আওরঙ্গ কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

মদন ঠোঁটে আংগুল চাপ দিয়ে বলে উঠে চুপ। কথা বলো না

আওরঙ্গের কিছু বলা হয় না, সে নির্বাকভাবে তাকিয়ে থাকে কারাকক্ষের ঘুমন্ত বন্দীর মুখের দিকে।

মদন বলে—কি দেখছো অমন হা করে?

দেখছি দস্যু বনহুরকে......

হাঁ দেখো আমাদের রাণী কত বড় বীর রমণী যার অসাধ্য কিছু নেই।

তাইতো দেখছি।

দু'জন প্রহরী এতোক্ষণ বসে ঝিমুচ্ছিলো তারা সজাগ হয়ে উঠে। একজন বলে বসে—কে রে?

মদন এক মুখ হেসে বলে—আমরা।

তোমরা এখানে কেনো?

মদন জবাব দেয়—আমরা বন্দীকে দেখতে এসেছি।

তোমার সঙ্গী কে?

আওরঙ্গ চাচা।

ও বুড়োর আবার বন্দী দেখার সখ।

দস্যু বনহুরকে সে দেখেনি কোনোদিন তাই।

বেশ করেছো এবার চলে যাও।

কথাবার্তায় জেগে উঠেছে বন্দী। সে উঠে বসে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। নিদ্রাজড়িত দু'টি চোখ ঢল ঢল করছে বন্দীর।

আওরঙ্গ স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

বন্দী শয্যা ত্যাগ করে উঠে এলো লৌহশিকের পাশে। আওরঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলো সি স্থির দৃষ্টি মেলে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো আওরঙ্গ। তার দু'হাতে দু'টি ক্ষুদ্রাকৃতি আগ্নেয় অস্ত্র। বললো সে—খবরদার, এক পা নড়বে না।

মদন এবং প্রহরীদ্বয় আচমকা আওরঙ্গকে রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে দেখে হকচকিয়ে গেলো। প্রহরীদ্বয় তাদের হস্তস্থিত অস্ত্র উঁচু করবার সুযোগ পেলো না। তারা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

আওরঙ্গ বজ্রকঠিন কণ্ঠে বললো—হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।

মদন বললো—আওরঙ্গ তুমি......

পরে সব শুনবে, এবার আমার কথা মতো কাজ করো, না হলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রহরীর নিকট থেকে চাবি নাও খোলো বন্দীশালার দরজা। যাও—তাকিয়ে আছো কেন।

মদন প্রথম প্রহরীর নিকট থেকে চাবি নিয়ে খুলে ফেলে লৌহ কারাগারের দরজাটা।

আওরঙ্গ বলে এবার—অস্ত্র ফেলে দাও প্রহরীদ্বয়। দাও বলছি...

বাধ্য হলো ওরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে।

আওরঙ্গ বললো—মদন, প্রহরীদ্বয় সহ বন্দীশালায় প্রবেশ করো, নাচেৎ......অস্ত্র দুটি ঠিকভাবে উঁচু করে ধরে কথাটা অর্ধসমাপ্ত ভাবে শেষ করে সে।

মদন এবং প্রহরীদ্বয় যত সাহসীই হোকনা কেনো, তারা আওরঙ্গের হস্তস্থিত ক্ষুদ্র অস্ত্র দুটির দিকে তাকিয়ে একেবারে দমে গেছে যেনো। মদন ভাবতে পারেনি বৃদ্ধা আওরঙ্গ এমনভাবে তাদের পরাজিত করতে পারবে। ওরা ভিজে বিড়ালের মতো বন্দীশালায় প্রবেশ করে। মদন দাঁতে অধর দংশন করতে লাগলো।

প্রদীপ কুমার বন্দীশালার মধ্যে থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। বৃদ্ধ লোকটা কে? আর কেনই বা সে এভাবে এখানে এসেছে? কি এর উদ্দেশ্য?

ততোক্ষণে আওরঙ্গ প্রহরীদ্বয়ের ফেলে দেওয়া অস্ত্রগুলো পা দিয়ে সরিয়ে ফেলে, তারপর বলে উঠে সে—প্রদীপ কুমার, বেরিয়ে আসুন।

বেরিয়ে আসুন আপনি......

প্রদীপ কুমার অবাক না হয়ে পারে না, কে এই ব্যক্তি যে তার নামটাও জানে। বেরিয়ে আসে প্রদীপ কুমার দ্রুত পদক্ষেপে কারাকক্ষ থেকে।

আওরঙ্গ মুহূর্তের জন্যও নিজের হস্তস্থিত ক্ষুদ্র আগ্নেয় অস্ত্র দুটো নত করে নিল। সে এবার অস্ত্র দুটি জামার পকেটে রেখে নিজের হাতে লৌহ কারাকক্ষের তালা বন্ধ করে ফেললো।

মদন বললো—আওরঙ্গ, তোমার মনে এতো শয়তানি ছিলো...... দাঁতে দাঁত পিষতে থাকে সে।

আওরঙ্গ বললো—চললাম মদন বাবাজী। তারপর প্রদীপ কুমারকে লক্ষ্য করে বললো—আসুন রাজকুমার।

❑

মুক্ত আকাশের কুলে এসে দাঁড়ালো আওরঙ্গ আর প্রদীপ কুমার। উপরে আকাশ, নিচে প্রান্তর, সম্মুখে সীমাহীন শূন্যতা। ভোর হয়ে এসেছে, শুকতারা ঝকমক করছে!

প্রদীপ কুমার বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলো, কারণ বহুদিন বন্দী থাকায় তার দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। সুড়ঙ্গ পথে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে ওরা। আওরঙ্গ বললো—রাজকুমার এবার আপনি বিশ্রাম করুন।

প্রদীপ কুমারের ললাটে ফুটে উঠেছিলো বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাতের পিঠে ঘাম মুছে ফেললো, তারপর বসে পড়লো সে ঘাসের উপর।

আওরঙ্গও বসলো ওর পাশে।

প্রদীপ কুমার একটু বিশ্রাম করার পর আওরঙ্গকে লক্ষ্য করে বললো—কে তুমি বন্ধু আমাকে এভাবে উদ্ধার করলে? বলো কে তুমি?

আওরঙ্গ একমুখ হেসে বললো—আমি আওরঙ্গ।

না তুমি আওরঙ্গ নও, তুমি......

বলো, থামলে কেনো?

তুমি নিশ্চয়ই সেই......

পরবর্তী বই
দস্যুরাণীর কবলে দস্যু বনহুর